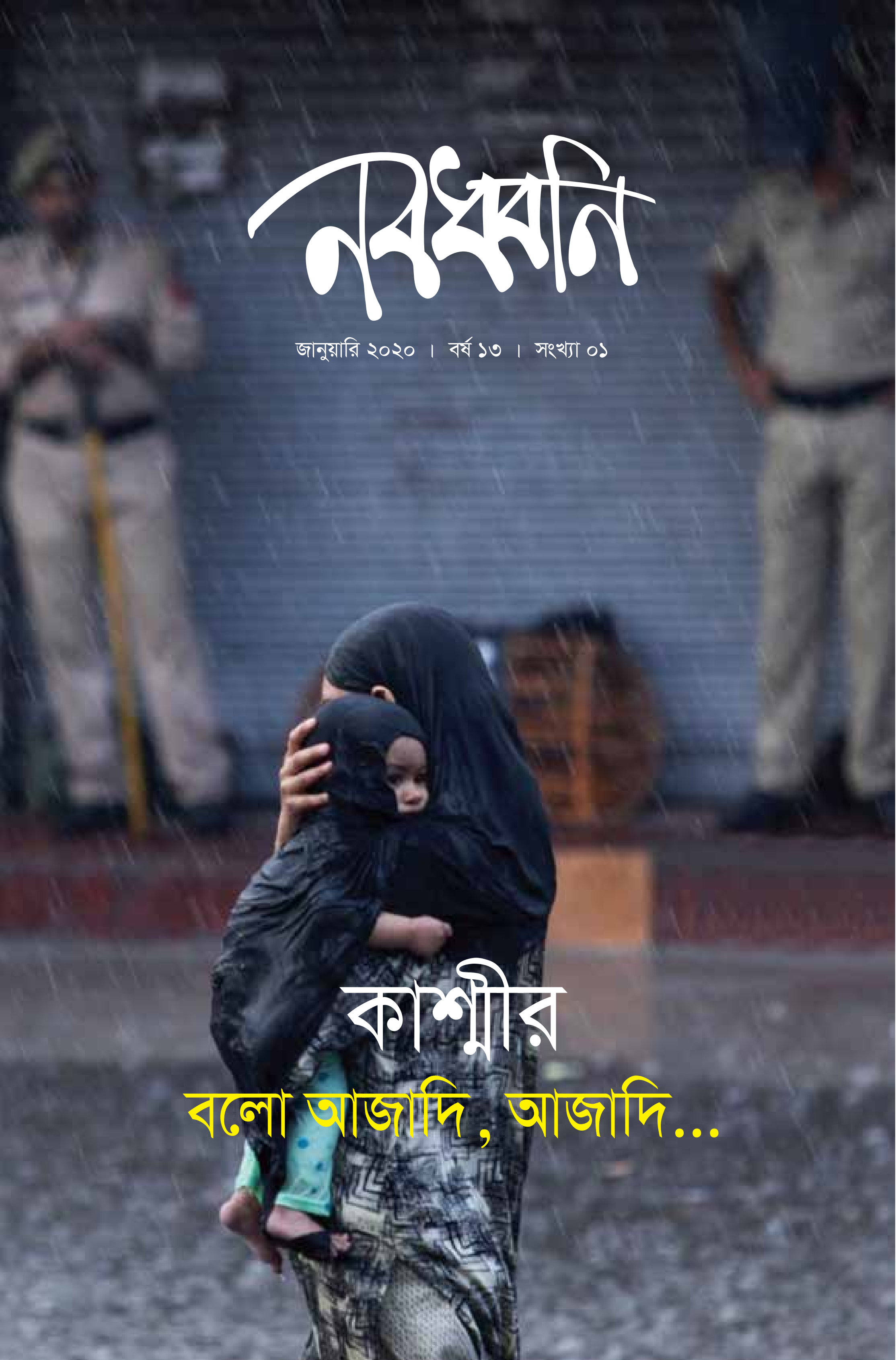
নবধ্বনি

জানুয়ারি ২০২০ । বর্ষ ১৩ । সংখ্যা ০১



কাশ্মীর

বলো আজাদি, আজাদি...

জানুয়ারি ২০২০ । বর্ষ ১৩ । সংখ্যা ০১

মূল্য ৫ টাকা মাত্র

নবধ্বনি । দোকান নং ২৭ । ২য় তলা । ইসলামী টাওয়ার ১১/১ বাংলাবাজার । ঢাকা
সার্কুলেশন : ০১৩১৮ ৬৩৪৪১২ । সম্পাদনা : ০১৭৪৫ ১৩৯২১৫

Email: nobodhoni@gmail.com web: noboprokash.com/nobodhoni

স্বাগত কলাম

এবার খুব শীত পড়েছে। বিগত দশ-পনেরো বছরে এমন শীত পড়েনি। সেই সঙ্গে শীত মৌসুমে অযাচিত বৃষ্টি আর বারদুয়েক শৈত্যপ্রবাহ শীতটাকে যেন আরও চাগিয়ে দিয়েছিল। শীতে কাবু পুরো দেশ। আবার স্মরণ করে দেখুন, এবারকার গরম মৌসুমে গরমটাও পড়েছিল যাচ্ছেতাইভাবে। গরমে একদম জেরবার হয়ে গিয়েছিল দেশবাসী। আবহাওয়া অফিস থেকে জানা গিয়েছিল, বিগত পঞ্চাশ বছরে আর এরকম গরম পড়েনি বাংলাদেশে।

বিষয়টি কি বুঝতে পারছেন? জলবায়ু পরিবর্তন বা ক্লাইমেট চেঞ্জ। সারা পৃথিবীজুড়ে যে বিষয় নিয়ে তোলপাড় চলছে, সেই জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে আমাদের দেশে। সহস্র বছরের যে স্বাভাবিক জলবায়ু চলে আসছিল পৃথিবীতে, এই আধুনিক সভ্যতার অভিশাপে সেই জলবায়ু দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। শীতের সময়ে হয় খুব শীত পড়ছে বা শীত একেবারেই কমে যাচ্ছে, অমৌসুমে বৃষ্টি হচ্ছে; আবার গরমের মৌসুমে প্রচণ্ড গরম পড়ছে, কখনোবা বৃষ্টির মৌসুমে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির কারণে ভুক্তভোগী হচ্ছে কোটি মানুষ। সারা পৃথিবীতেই ঘটে চলেছে এই পরিবর্তন।

গত বছর পৃথিবীর ফুসফুস বলে খ্যাত আমাজন বনের বেশ কিছু অংশ মানুষের লোভের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আবার গত ডিসেম্বর থেকে এ বছর জানুয়ারির শুরু পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার উপকূলবর্তী বনাঞ্চলের হাজার হাজার মাইল দাবানলের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পুড়ে মারা গেছে লাখ লাখ বন্য পশু-পাখি। এর প্রভাব যে খুব বিরূপভাবে আমাদের পরিবেশের ওপর পড়বে, সে কথা বলাই বাহুল্য। সভ্যতার নগরায়নের ফলে প্রতিটি দেশ থেকে গাছপালা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। তার ওপর এসব সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে পৃথিবীর সবুজ আরও দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। ফলে, ভবিষ্যতে আমরা আরও বেশি করে জলবায়ু পরিবর্তনের মুখোমুখি হব। ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের কৃষি, আমাদের সমুদ্র উপকূলবর্তী মানুষের জীবন বিপন্নহবে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় আগের চেয়ে বেড়ে যাবে, ঝড়, বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি আরও প্রকট আকার ধারণ করবে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশেষত সবুজ প্রকৃতি মানুষের নিঃস্বার্থ এক বন্ধু। আমরা যত আধুনিক হচ্ছি, সভ্যতা যত উন্নত হচ্ছে, গাছপালা তত কমে যাচ্ছে আমাদের চারপাশ থেকে। কিন্তু আমাদের এই নিঃস্বার্থ বন্ধুকে আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। বেশি করে গাছ লাগাতে হবে, গাছের পরিচর্যা করতে হবে, প্রাকৃতিক বনাঞ্চল রক্ষার ব্যাপারে সোচ্চার হতে হবে এবং সর্বোপরি পরিবেশ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে। বাড়ি বা বহুতল ভবন নির্মাণ করলে তার চারপাশে অবশ্যই অধিক পরিমাণে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। রাস্তার পাশে বা বাড়ির চারপাশের খালি জায়গায় বৃক্ষরোপন করতে হবে। নিজের উদ্যোগে বা সামাজিক সংঘ, স্কুল-কলেজ-মাদরাসার উদ্যোগে এলাকায় এলাকায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

এসব আমাদের জন্য যেমন, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও। আমরা আমাদের সন্তানদের সুখী ভবিষ্যতের জন্য কত কিছুই না করছি। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী দুর্যোগের কবল থেকে বাঁচাতে আমরা কি এতটুকু করতে পারি না?



একদল নক্ষত্রের খোঁজে

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

ধরুন, আপনি কোনোভাবে এ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে গেলেন। মন্ত্রী হওয়ার পর আপনার দৃঢ় প্রত্যয়–যে কোনোভাবে হোক আপনি রাষ্ট্রীয় সকল দপ্তর থেকে দুর্নীতি দূর করবেন। তাহলে প্রথমে আপনাকে মন্ত্রণালয়ের সকল সচিব থেকে পিয়ন পর্যন্ত সবাইকে নৈতিকভাবে শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। এরপর আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিটি সদস্য, দেশের প্রতিটি থানা, আইন প্রয়োগকারী অন্যান্য সংস্থা, যেমন মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সড়ক-নৌ-রেল বিভাগ, উপজেলার প্রতিটি সরকারি দপ্তর, স্থানীয় সরকার, রাষ্ট্রীয় প্রতিটি সরকারি দপ্তর থেকে তুলনামূলক দুর্নীতি দূর করতে হবে। কিন্তু সেটা নিশ্চিত করা কি সম্ভব? স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখলে সম্ভব না। কারণ দুর্নীতি, অনৈতিকতা এবং অসদুপায় আমাদের সমাজে একটা 'সিস্টেমে' পরিণত হয়েছে, একটা আবশ্যিক অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। আপনি যদি এই সিস্টেম শুদ্ধ করতে চান তাহলে অনৈতিক আচরণের পুরো সিস্টেমটাই ভেঙে ফেলতে হবে। নইলে আপনি দেখবেন, সচিবগণ ঠিকই শতভাগ নৈতিকতার সঙ্গে তাদের সরকারি আদেশ প্রণয়ন করছেন, কিন্তু জেলা বা উপজেলাভিত্তিক সরকারি অফিসে গিয়ে সে আদেশ বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কারণ, হতে পারে সেখানকার অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী আগে থেকেই দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে আছে। পুলিশের হেডকোয়ার্টার থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদের গ্রেফতারের আদেশ গেল, কিন্তু দেশব্যাপী শত শত থানার পুলিশ সদস্যরা সে আদেশ অনুযায়ী কাজ করল না, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের লোকজন মাদক নির্মূলের নামে তাদের কাজে গাফলতি করল, ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীগণ জনগণের জন্য বরাদ্দ অর্থ বা সম্পদ লোপাট করে নিল। সুতরাং ফলাফল কিন্তু সেই শূন্য। কারণ, সরকার এবং জনগণ–সবার মাঝে দুর্নীতি এবং অনৈতিকতা একটা শক্ত সিস্টেমে রূপলাভ করেছে। এক শত, এক হাজার, এক লাখ মানুষকে যদি শুদ্ধ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তবু কিন্তু

এই সিস্টেম ভাঙবে না; আপনাকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রত্যেক সদস্যের মনে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা জাগ্রত করতে হবে।
অনৈতিকতার এই আবশ্যিক সিস্টেমটা দেখতে কেমন, তার একটা উদাহরণ দেখুন। ধরুন, স্নাতক পাশ একজন চাকরিপ্রত্যাশী যুবক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য নিয়োগ পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষা দেয়ার পর তার প্রথম কাজ কী হয় জানেন? সে এই পদে চাকরি নিশ্চিত করতে একজন 'দালালের' খোঁজ করতে থাকে, যে টাকার বিনিময়ে তাকে চাকরির নিশ্চয়তা দেবে। এই টাকার পরিমাণ তিন থেকে ছয় লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। বেশিও হতে পারে। বর্তমানে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বাজারমূল্য কেমন চলছে সে ব্যাপারে আমার ধারণা নেই। যা হোক, এটা সারাদেশের চিত্র এবং সকল সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দু-একটা চাকরি টাকার বিনিময় ছাড়া হতে পারে কিন্তু সমাজ বাস্তবতা হলো, উপরমহলে টাকা বা ঘুষ ছাড়া সরকারি চাকরির নিশ্চয়তা কেউ করে না। এই যে 'কেউ আশা করে না', এটাই হলো সিস্টেম; যেটা সমাজে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সমাজে যেটা স্বাভাবিক প্রচলন হয়ে যায় সেটা তখন একটা সিস্টেমে রূপলাভ করে। এ কারণে এখন সদ্য সরকারি চাকুরিপ্রাপ্ত কেউ এসে যদি আপনাকে বলে, তিনি ঘুষ বা দালাল ছাড়া চাকরিতে নিয়োগ পেয়েছেন তাহলে আপনি তার কথা বিশ্বাস করবেন না। ভাববেন, তিনি নিশ্চয় মিথ্যাকথা বলছেন। এই যে আপনার অবিশ্বাস, এটা এজন্য হয়েছে যে সমাজে ঘুষ এবং দালালের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, এটা একটা আবশ্যিক সিস্টেমে পরিণত হয়ে গেছে। এই সিস্টেমের ব্যাত্যয় হলে আপনার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, আপনি সেই সত্যকে অবিশ্বাস করছেন। এটাই অবধারিত সিস্টেম। বছরের পর বছর ধরে চলতে চলতে আমাদের সমাজে এই অনৈতিকতা ও দুর্নীতি একটা স্বাভাবিক সিস্টেমে পরিণত হয়েছে। ফলে এটাকে ভাঙা সুকঠিন এক বাস্তবতা।
এখানে আমি মাত্র এক ধরনের অনৈতিকতার উদাহরণ দিলাম। কিন্তু অনৈতিকতার এমন আরও শত শত পন্থা রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আমাদের দেশে দুর্নীতি হচ্ছে, অস্বীকারের উপায় নেই।
দুর্নীতি পৃথিবীর সব দেশেই হয়। কিন্তু দেশভেদে সেটার মাত্রার কম-বেশ আছে। আমাদের দেশের মতো সেটা যখন সমাজের স্বাভাবিক সিস্টেমে পরিণত হয়ে যায় তখন সেটাকে সুস্থ দেশ বলা যায় না। তখন দেশ নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে, দুশ্চিন্তা করতে হবে। আপনার হাত কেটে গেলে আপনি জলদি ডাক্তারের কাছে গিয়ে ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করে প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবনে ব্রতী হন। দেশটা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে, তখন কেন আপনার টনক নড়ে না? শরীরের রোগ নিয়ে আপনি এত দুশ্চিন্তগ্রস্ত, দেশের রোগ নিয়েও আপনাকে চিন্তিত হতে হবে। আপনার আমার কি উচিত নয় দেশের এই রোগ সারানোর নিরাময়ে উদ্যোগী হওয়ার?
সেটা কীভাবে সম্ভব? আসুন, আমরা দেশের রোগ নিরাময়ের সম্ভাব্য দাওয়াই নিয়ে খানিক আলাপ করি।
প্রথমে আপনাকে রোগটা নির্ণয় করতে হবে–কেন মানুষ দুর্নীতি করছে বা অনৈতিকার সঙ্গে জড়িত? আমরা যদি দেখি তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারব, মানুষের মাঝে আসলে নৈতিকতার কোনো দায় নেই। যারা দুর্নীতি করে থাকেন, অসদুপায় অবলম্বন করেন, অনৈতিকভাবে মানুষের হক নষ্ট করছেন যারা–তাদের ভেতরে না আছে মনুষ্যত্ববোধ, দেশপ্রেম আর না আছে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়। একজন সত্যিকারের মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ কখনোই আরেকজনের হকের টাকা অন্যায়ভাবে ভোগ করতে পারেন না। একজন দেশপ্রেমিক মানুষ কোনোভাবেই দেশের সাধারণ জনগণের হকের টাকা মেরে নিজে সম্পদের কুমির হতে পারেন না। পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় যার আছে তিনি কোনোদিনই অপরের সম্পদ গ্রাস করতে পারেন না।
সুতরাং প্রথম কাজ হলো, মানুষের মনে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করা। কিন্তু এটা যত সহজেই বলা যাচ্ছে বাস্তবায়ন তত সহজ নয়। আপনি আজকে চাইলে আজকেই সারা বাংলাদেশের মানুষের মনে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা জাগ্রত করতে পারবেন না। একদিনের ওয়াজে সবাই সুফি-দরবেশ হয়ে যাবে না। এটা একটা শক্ত সিস্টেমে পরিণত

হয়েছে। সমাজের কোটি কোটি মানুষ এই সিস্টেমের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত হয়ে গেছে। বাজারের মাছবিক্রেতা মাছে ফরমালিন মেশাচ্ছেন, আবার মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের টাকার অর্ধেক লোপাট করে দিচ্ছেন। কৃষক ভালো বেগুন বলে পোকা বেগুন বিক্রি করছেন, আবার উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা ভুয়া বরাদ্দ দেখিয়ে পকেটে পুরছেন লাখ লাখ টাকা। পুরো সমাজ অনৈতিকতার ছড়ানো জালে বন্দী। ক্ষুদ্র থেকে শুরু করে আজদাহা আকারের দুর্নীতিতে আমরা সবাই জড়িয়ে গেছি।

এই সিস্টেম যেমন শক্তভাবে আমাদের সমাজে গেঁথে গেছে, যত গভীরে এর শিকড় প্রোথিত হয়েছে, ঠিক তত কঠিনভাবে এর চিকিৎসা করতে হবে; এর চিকিৎসাও তত দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল হবে। এক দিনেই বা এক বছরে আপনি এটাকে নির্মূল করতে পারবেন না। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ প্রচেষ্টা এবং সঠিক লক্ষ্য। নৈতিকতার প্রধান দুটি মাধ্যম হলো পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আপনার ছেলেকে নৈতিকভাবে শতভাগ খাঁটি বানাতে চান, অথচ আপনি নিজেই মিথ্যাকথা বলেন কিংবা রাষ্ট্রীয় কর প্রদান করেন না অথবা ময়লা ডাস্টবিনে না ফেলে রাস্তার পাশে ফেলেন; তাহলে আপনার সন্তান কোনোদিন নৈতিকতার মানদণ্ড বিচার করতে পারবে না। পরিবার আমাদের সবার প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র। একজন গোয়ালিনীর সন্তান যদি তার মাকে দেখে যে তার মা দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করছে, ওই সন্তান পরিবার থেকে দুর্নীতির সবক নিয়ে নিল। দোকানদারের ছেলে যদি দেখে তার বাবা মিনিকেট চাল বলে ইরি ধানের চাল বিক্রি করছে, ধরে নিতে পারেন এই ছেলে বড় হলে নৈতিকতার তোয়াক্কা করবে না। ভাই যদি বোনকে দেখে সে মোবাইলে হামেশা মিথ্যাকথা বলছে, ওই ভাই কখনো সত্যবাদী হবে না। এ কারণে পরিবারের প্রত্যেক সদস্য একজন অপরজনের শিক্ষক হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। মা-বাবা যদি সন্তানকে মিথ্যা বলার জন্য কখনো শাস্তি না দেন, অন্যায় আচরণের কারণে শাসন না করেন তাহলে সে কখনো মনুষ্যত্ববোধ শিখবে না। তাকে যদি পরিবার থেকে ধর্মের প্রতি অনুরাগী না করা হয় সে কখনোই নৈতিকতার গুরুত্ব শিখবে না।

সবচে জরুরি কাজটা হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। বাংলাদেশের কোনো স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-মাদরাসা নিশ্চয়তা দেয় না যে তাদের শিক্ষার্থীরা নৈতিকভাবে খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের মতো দৃঢ়পদ হবে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কেবল কেতাবি বিদ্যা শেখানোর দিকে যতটা আগ্রহী, নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষে উদ্ভাসিত মানুষ তৈরিতে ততটা আগ্রহী নয়। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিজন শিক্ষক তাদের শিক্ষার্থীদের সামনে একেকজন মহামানব, তারা তাদের জীবনের আইডল হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন এই শিক্ষকগণই যদি ছোট-বড় নানা অনৈতিকতার সঙ্গে জড়িত থাকেন কিংবা চারিত্রিকভাবে ত্রুটিগ্রস্ত হন, তাহলে সারা জীবন আপনি দেশপ্রেম আর ধর্মের বাণী শুনিয়েও মন্ত্রী থেকে শুরু করে পিয়নকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পারবেন না।

সেটা না হলে আপনি দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করবেন কীভাবে? যে ছেলেটা পাঁচ-দশ লাখ টাকা অনৈতিক ঘুষ দিয়ে পুলিশের চাকরিতে নিয়োগ পেল, তার কাছ থেকে কীভাবে আপনি ঈমানদারিত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনের আশা করতে পারেন? কিন্তু একজন শিক্ষক যদি তাকে শিক্ষাকালীন বলে দিতেন, কখনো ঘুষ যেমন দেবে না তেমনি অনৈতিকভাবে কারো সম্পদ হস্তগত করবে না, সেই তৃতীয় শ্রেণি থেকে প্রত্যেকজন শিক্ষার্থীকে যদি নৈতিকতার প্রতি কঠোর শিক্ষা দেয়া হয় তাহলে এই শিক্ষার্থী নৈতিকভাবে অনেকটাই বিপদমুক্ত থাকবে বলে আশা করা যায়।

বিদ্যালয় মানুষ গড়ার কারখানা। এখান থেকেই নির্ধারিত হয় একজন ছাত্র কীভাবে তার পরবর্তী জীবন পরিচালনা করবে। একজন শিক্ষক হলেন সেই কারখানার নিপুণ কারিগর। তিনি একজন কুমোরের মতো, নিজ হাতে মাটির কলস যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সেটার অবয়ব নির্মাণ করতে পারেন। একজন ছাত্র ঠিক সেই মাটির কলসের মতো, এই কারিগরের হাতে তার ভাগ্য নির্মিত হচ্ছে। এ বিষয়টি একজন শিক্ষককে বুঝতে হবে। একজন শিক্ষক যদি নিজেকে কেবল পাঠ্যপুস্তক পড়ানোর মেশিন মনে করে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে, ওই শিক্ষকের শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতায় ঘাটতি রয়ে গেছে। বড় বড় ডিগ্রি বা

ভালো ফলাফলের জন্যই কেবল বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়নি, শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্যই হলো সেখান থেকে প্রত্যেকজন ছাত্র মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন সত্যিকারের মানুষ হিসেবে বের হয়ে আসবে। পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে নৈতিক শিক্ষা আমাদের সমাজের জন্য অনেক বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে।

কিন্তু সেটা কি আমাদের দেশে হচ্ছে?

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছাত্রদের যেভাবে এ-প্লাস অর্জনের জন্য গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, সত্যবাদিতা কিংবা নৈতিকতার জন্য কি সেভাবে প্রয়াস করেন? সবচে দুঃখের বিষয় হলো, মাদরাসার মতো ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেও দিনকে দিন নৈতিকতার শিক্ষা দূরে সরে যাচ্ছে। অথচ ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তিই হলো নৈতিকতা, কেতাবি বিদ্যা সেখানে মুখ্য নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এখন আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিকতা শিক্ষা দিতে পারছে না। তাহলে আমরা এখন কী করব? একেবারেই হতাশ হয়ে যাব রাষ্ট্রের ভবিষ্যত বিষয়ে? কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেয়া আমাদের জন্য উচিত হবে না। একজন মুমিন তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আশাবাদী। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, 'তোমরা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।' সুতরাং আমাদের হতাশ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এমতাবস্থায় আমরা বিকল্প একটা চিন্তা করতে পারি। যেহেতু সারা দেশের সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একযোগে নৈতিকতার শিক্ষাদান সম্ভব নয়, নানা কারণেই। তাহলে আমাদের উচিত, আমরা নিজেরা যেসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছি, নিজেরা যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করি, সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কঠোরভাবে নৈতিকতার দিকে নজর দেয়া। সার্বিকভাবে এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন যেখানকার শীক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও চরিত্র নিয়ে বাজি ধরা যাবে। সেখানে পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়া হবে সত্যবাদিতা, সৎউপার্জন, অল্পেতুষ্টি, পরোপকার, সাহসিকতা, দেশপ্রেম, শৃংখলা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠতা, ধর্মীয় সম্মান রক্ষা, সচ্চরিত্র, নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ব্যবহারিক জ্ঞান, পরমত সহিষ্ণুতা এবং সকল সুকুমারবৃত্তি। ক্যাডেট কলেজগুলোতে যেমন শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে একেকজন ক্যাডেটকে সুশৃংখল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা হয়, তেমনি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেও নৈতিকতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পাঠদান করা হবে। এখানকার একজন শিক্ষার্থী যখন রাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসেবে যোগ দেবে তখন সেখানে তার চারিত্রিক দৃঢ়তা আর সবার জন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করবে। এসব প্রতিষ্ঠানের একজন ছাত্র যখন সমাজে বাস করবে, তার সচ্চরিত্র হাজার জনকে প্রভাবিত করবে। এখানকার একেকজন শিক্ষার্থী সমাজের একেকজন উমর, আলি, উমর ইবনে আবদুল আজিজ হয়ে বিকশিত হবে। একজনকে দুর্নীতি করতে দেখে দশজন যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হতে পারে তাহলে একজনকে দেখে দশজন কেন সচ্চরিত্রবান হবে না? জমাট অন্ধকারে দশজন যদি হারিয়ে যেতে পারে, একজনের হৃদয়ের আলো কেন দশজনকে আলোকিত করবে না? যেখানে অন্ধকার, আলোর প্রয়োজন সেখানেই সবচে বেশি।

নৈতিকতা এমন একটা জরুরি বিষয়, যার সঙ্গে রাষ্ট্র থেকে শুরু করে আমাদের পরিবার ও ব্যক্তিজীবন সমানভাবে জড়িত ও প্রভাবিত। এ কারণে আমাদের পরিবার থেকে নৈতিকতার শিক্ষা শুরু করতে হবে। তেমনিভাবে যে বিষয়ে আলোকপাত করা হলো, আমাদের কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নৈতিকতার প্রশ্নে এমন কঠোর হওয়া প্রয়োজন যাতে তারা সমাজে প্রভাব বিস্তার লাভ করতে পারে এবং সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে। দেশের জন্য এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একেকজন নক্ষত্রের মতো যেন হতে পারে। নৈতিকতার ভিত তাদের হৃদয়ে এমনভাবে প্রোথিত করতে হবে যাতে তারা সমাজের জন্য উদাহরণ হতে পারে। সমাজের যে স্তরেই তারা থাকুক না কেন, হোক সে সচিবালয়ের কর্মকর্তা, মসজিদের ইমাম বা মাদরাসার শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা উপজেলা কর্মকর্তা, সাধারণ ব্যবসায়ী বা পুলিশের এসআই–প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা যেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জাজ্বল্যমান হতে পারে। এভাবে শত শত নক্ষত্র যখন একে একে জ্বলে উঠবে তখন অন্ধকার যত গাঢ়ই হোক, তা বিদূরিত হবেই।



কাশ্মীরিদের বঞ্চনার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

রাগিব রব্বানি

পৃথিবীর স্বর্গ খ্যাত অপরূপ উপত্যকা কাশ্মীর, কিন্তু ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তি যুগের পর যুগ ধরে এই উপত্যকাকে উন্মুক্ত কারাগার বানিয়ে রেখেছে।
খ্রিষ্টাব্দ অষ্টম শতাব্দীতে এখানে ইসলামের আগমন ঘটে। তারপর কালের পরিক্রমায় পুরো উপত্যকাই একসময় হয়ে ওঠে মুসলিম অধ্যুষিত। ১৫৮৬ সালে মোঘল সম্রাট আকবরের সময় কাশ্মীর মোঘল সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত হয়। বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগিরের সময়কাল অবধি দুর্দণ্ড প্রতাপে তা পরিচালিত হয় মোঘল শাসকদের হাতে। আওরঙ্গজেবের ইন্তেকালের পর এখানে মোঘল কর্তৃত্ব দুর্বল হতে শুরু করে এবং ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে আফগান শাসক আহমদ শাহ দুররানি কাশ্মীরের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।
১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে শিখ রাজা রঞ্জিত সিং মুসলিম অধ্যুষিত এ ভূমি দখল করে নেন এবং এর মধ্য দিয়েই মূলত কাশ্মীরি মুসলমানদের বঞ্চনার ইতিহাসের সূচনা হয়। ২৭ বছরের শিখ শাসনে পর্যুদস্ত হয় এ জনপদ। গরু জবাই নিষিদ্ধের পাশাপাশি ভারী করের বোঝা চাপানো হয় কাশ্মীরি মুসলমানদের ওপর। হাজার হাজার মানুষ জুলুমের আতিশয্যে ঘরবাড়ির মায়া ত্যাগ করে হিজরত করতে বাধ্য হয়।
১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ-শিখ যুদ্ধের পর দুপক্ষের মধ্যে 'অমৃতসার চুক্তি' সাক্ষরিত হলে কাশ্মীর চলে যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। কিন্তু চতুর কোম্পানি এ অঞ্চল নিজেদের কাছে না রেখে পাশ্ববর্তী জম্মু অঞ্চলে তাদের আজ্ঞাবহ দোগরা শিখ শাসক গুলাব সিংয়ের কাছে ৭৫ লাখ রুপির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। আর এর মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় আজকের জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য।
উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন বিলুপ্তির আগ অবধি জম্মু-কাশ্মীর দোগরাদের শাসনাধীন ছিল বটে, কিন্তু এর পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রিত হতো ইংরেজদের হাতেই। প্রায় একশ' বছরের দোগরা শাসনে মুসলমানরা কেবল পর্যুদস্তই হয়েছে, যা ছিল পূর্বেকার শিখ শাসনের ধারাবাহিকতা এবং সম্প্রসারণ। মুসলমানদের জন্য শিক্ষাদীক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না। সরকারি কাজে তাদের বেগার খাটানো হতো। বিনা মূল্যে সরকারি কাজ করে দিতে বাধ্য করা হতো মুসলিম জনসাধারণকে। চাষীদের কাছ থেকে এতো বেশি রাজস্ব আদায় করা হতো যে রাজস্ব আদায়ের পর তাদের কাছে খেয়ে-পরে বাঁচার মতো শষ্যও থাকত না।

বৈষম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ
শত বছর ধরে চলে আসা এই জুলুম ও বঞ্চিতির কোনো প্রতিবাদ করত না কাশ্মীরের মুসলমানেরা। অশিক্ষার অভিশাপ তাদেরকে এতটাই গ্রাস করে রেখেছিল যে, অন্তহীন এ জুলুমের বিরুদ্ধে যে সোচ্চার হওয়া যায়, সে বোধটুকুও তাদের ছিল না। কিন্তু নিজেদের ধর্মানুভূতিতে যখন আঘাত হানল শাসকশ্রেণি, তখনই তাদের প্রতিবাদী সত্তা জেগে উঠল। জম্মু ও কাশ্মীরের দোগরা শাসকদের প্রতি তাদের মনে স্বভাবজাত যে ক্ষোভ কাজ করত, ১৯৩১ সালের একটি ঘটনার ফলে সেই ক্ষোভ সহসাই দোগরা শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নেয়।
১৯৩১ সালে জম্মুর কয়েকটি এলাকায় প্রশাসনের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা মসজিদ ও কুরআন শরিফের অবমাননা করে। এ খবর ছড়িয়ে পড়ে পুরো কাশ্মীর উপত্যকায়। শিক্ষার আলো থেকে দূরে থাকা খেটে খাওয়া কাশ্মীরি মুসলমানরা নিজেদের ধর্মের প্রশ্নে খুব সোচ্চার ছিল। সরকারি কর্মকর্তাদের ধর্ম অবমাননায় তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। কাশ্মীরের রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তার। এমনই এক বিক্ষোভ সমাবেশে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে আসা আবদুল কাদির নামের এক ব্যক্তি দোগরা রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দেনভ। সাথে সাথে তাকে গ্রেফতার করে দোগরা রাজের প্রশাসন। ১৩ জুলাই ১৯৩১-এ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের কেন্দ্রীয় কয়েদখানায় আবদুল কাদিরের মামলার শুনানির দিন ধার্য করা হয়। সেদিন শ্রীনগর কেন্দ্রীয় কয়েদখানার সামনে বিশাল জনসমাবেশের সৃষ্টি হয়। সেখানে পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে ২২ জন মুসলিম নিহত হন।
এই ঘটনায় ১৩ জুলাইকে এখনো কাশ্মীরে 'শহীদ দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। শত বছরের নিপীড়নের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা কাশ্মীরিরা এ দিনই সর্বপ্রথম নিজেদের আজাদির জন্য বুকের তপ্ত খুন ঝরিয়েছিল।
ভারতের অধিভুক্তি
তারপর নানা ঘটনা-উপঘটনা। দোগরা শিখদের অত্যাচারে জম্মু থেকে ৫ লাখ মুসলমান গৃহহারা হয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করে, যাদের মধ্যে দুই লাখ মানুষের সন্ধান পরবর্তীতে আর কোথাও পাওয়া যায়নি। উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ শাসনের সমাপ্তি ঘটল তারপর, ১৯৪৭-এ ভারত-পাকিস্তান ভাগ হলো। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য যেহেতু ইংরেজদের সরাসরি শাসনাধীন ছিল না, দেশ ভাগের পর তা তাই কার্যত স্বাধীন হয়ে যায়। সেখানকার মুসলমানরা দোগরা রাজার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে পাকিস্তানের সহায়তায়। তারা আজাদ কাশ্মীরের ঘোষণা দিয়ে জম্মু কাশ্মীরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূমি নিজেদের দখলে নিতে সক্ষম হয়। এ ঘটনা ১৯৪৭-এর অক্টোবরের।
দোগরা রাজের রাজধানী শ্রীনগর থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে ছিল আজাদ কাশ্মীরের ধারক বিপ্লবী বাহিনী, আরও একটা আক্রমণ করলেই শ্রীনগর দখল করে নিতে পারত তারা। কিন্তু সে আক্রমণে বেশ দেরি হয়ে যায়। ইতিমধ্যে দোগরা রাজা হরিসিং শ্রীনগর থেকে জম্মুতে পালিয়ে গিয়ে ভারতের কাছে সাহায্য কামনা করেন। ভারত শর্তারোপ-পূর্বক তাঁকে সাহায্য করতে সম্মত হয়। শর্ত হলো কংগ্রেস-ঘনিষ্ঠ কাশ্মীরি নেতা শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে সেখানে জরুরি অবস্থার একটি সরকার গঠন করতে হবে। হরিসিং শর্ত মেনে নেন। আর এর মধ্য দিয়েই কাশ্মীরে প্রবেশ করে ভারতীয় মিলিটারি। ১৯৪৭-এর ২৭ অক্টোবর ভারত বিশাল আকারে এয়ারলিফটিং-এর মাধ্যমে প্রায় ১০০টি সিভিল এবং মিলিটারি ট্রান্সপোর্ট বিমান ব্যবহার করে দুই ব্যাটেলিয়ন ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন শ্রীনগর এয়ারফিল্ডে অবতরণ করাতে সক্ষম হয়। এবং এর মধ্য দিয়ে কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীদের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেওয়া হয়।
স্বাধীনতাকামীরা যে অংশটুকু ইতিমধ্যে আয়ত্তে নিতে পেরেছে, সে অংশটুকুর ওপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজাদ কাশ্মীরের জন্ম হয়। যা পাকিস্তানের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে এখন বিবেচিত। আর বাকি ভূমিটুকু জবর দখল করে রাখে ভারত। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা মুতাবিক এ অঞ্চলকে যদিও স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়, কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি, যোগাযোগ ও সামরিক বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখা হয়। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ ৭০ বছরের অধিক কাল ধরে সামরিক জান্তা বাহিনী দিয়ে এ অঞ্চলের মানুষের ওপর হিন্দু শাসিত ভারত

নানাভাবে নিপীড়ন, ধর্ষণ ও গণহত্যা চালিয়ে এসেছে।

তারপরও এ অঞ্চলের মানুষ এতদিন ভিটেমাটি নিয়ে থাকতে পেরেছে, কারণ ৩৭০ ধারার সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী রাজ্যের বাইরের কেউ এখানে এসে জমিক্রয় বা বসতি স্থাপন করতে পারত না। কিন্তু গত ৫ আগস্ট ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ সোমবার ভারতের সংসদে বিজেপি সরকার সেই ৩৭০ ধারা বাতিল করে জম্মু-কাশ্মীরকে নিজেদের পুরোপুরি করায়ত্তে নিয়ে আসে।

৩৭০ ধারা বাতিলের এ সিদ্ধান্ত অনেকটা হঠাৎ করেই প্রকাশ করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। আগস্ট মাস শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের জবর দখলে থাকা জম্মু-কাশ্মীরে বহিরাগত সকল মানুষকে তোড়জোড় করে সরিয়ে দেওয়া হয়। পর্যটকদের বারণ করা হয় কাশ্মীর প্রবেশে। উপত্যকাটি এম্নিতেই পৃথিবীর শীর্ষ সামরিক অঞ্চল, ভারত সরকার এই তোড়জোড়ের সময় অতিরিক্ত আরও কয়েক প্লাটুন সৈন্য পাঠায় সেখানে। সরকারি হিসাবে যদিও এর পরিমাণ ৯ হাজার বলা হয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন বলেছে লক্ষাধিক সৈন্য সেসময়ে নতুন করে পাঠানো হয়েছে।

এই হঠাৎ বাড়তি প্রস্তুতি ও সতর্কতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে রাষ্ট্রীয়ভাবে জানানো হয়, কাশ্মীর সংক্রান্ত বিশেষ একটি ঘোষণা আসছে ৫ আগস্ট। তাই বাড়তি এই নিরাপত্তা-সতর্কতা। কিন্তু ঠিক কী ঘোষণা আসছে, তা কেউই আঁচ করতে পারেনি। অবশেষে আসে সেই ৫ আগস্ট। ভারতের রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির বিশেষ নির্দেশনামাটি পড়ে শোনান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহা। এতে প্রায় ৭০ বছর আগে ভারতীয় সংবিধানে কাশ্মীরকে দেয়া বিশেষ মর্যাদা সংবলিত ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের নির্দেশনা দেয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে ভারতের জবর দখলে থাকা জম্মু-কাশ্মীর এতদিন যে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে আসছিল, তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এ আইন পাশ হবার পর বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় ওঠে। সচেতন মানুষেরা এ সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানান। সেই সঙ্গে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে কাশ্মীরি জনগণ। কাশ্মীরের সকল রাজনৈতিক নেতা এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তাদের প্রত্যেককেই গৃহবন্দী করে রাখে দখলদার ভারত। মিলিটারিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে আসে কাশ্মীরি জনগণ। কিন্তু তাদেরকেও গণহারে গ্রেপ্তার করে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশির নামে নানা ধরনের হেনস্তা করে মিলিটারিরা। শহিদ করা হয় অনেককে। এ সবই হচ্ছিল কাশ্মীরকে কঠিন কারফিউর মাধ্যমে অবরুদ্ধ করে। ইন্টারনেট-মোবাইল যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল পুরো উপত্যকায়, বন্ধ ঘোষণা করা হয় সব ধরনের প্রতিষ্ঠান। এমনকি গণমাধ্যমকর্মীদেরও সেখানে স্বাধীনভাবে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। টানা একমাস জুড়ে কী ঘটেছিল কাশ্মীরে, কত মানুষের প্রাণ বিসর্জিত হয়েছে, কত মাবোনের ইজ্জত খোয়া গেছে, নিপীড়নের শিকার হয়েছেন কত লাখ মানুষ, তার কোনো কিছু বহির্বিশ্বকে জানতে দেয়নি ভারতীয় আগ্রাসনবাদীরা।

৫ আগস্ট বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করে কেড়ে নেওয়া হয় তার পৃথক রাজ্যের মর্যাদাও। এ জন্য ৫ আগস্ট রাজ্যসভায় এবং ৬ আগস্ট লোকসভায় পাশ করা হয় 'জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য পুনর্গঠন আইন ২০১৯'। রাষ্ট্রপতি ৯ আগস্ট তাতে সাক্ষর করেন। ৩১ অক্টোবর ২০১৯ থেকে নতুন এ আইন কার্যকর হয়। নতুন আইন অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীর থেকে কারগিল ও লাদাখকে আলাদা করে তৈরি করা হয় 'লাদাখ' নামের নতুন এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, যেখানে কোনো বিধানসভা থাকবে না। অন্যদিকে জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকার বাকি অংশও গণ্য হবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে, যদিও সেখানে বিধানসভা থাকবে। দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলই পরিচালনা করবেন দুইজন ল্যাফটেনেন্ট গভর্নর।

৩১ অক্টোবর ২০১৯ ভারতের জবর দখলে থাকা জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য আনুষ্ঠানিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। আর এর মধ্য দিয়ে কাশ্মীরি মুসলমানদের আজাদির স্বপ্নে পরাধীনতার শেষ পেরেকটি বসিয়ে দেয় আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদী শক্তি। কিন্তু এরপরও কাশ্মীরি জনগণের অতীত বলে, তারা তাদের আজাদির স্বপ্নকে মলিন হতে দেবে না, এই আগ্রাসনী সিদ্ধান্ত থেকে বরং তারা আরও বলীয়ান হবে নিজেদের আজাদির স্বপ্ন পূরণে।



কাশ্মীরিদের প্রতিরোধ-সংগ্রাম

আবু তাশফি

ভারতের দীর্ঘকালব্যাপী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে নানা রকমের প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছে কাশ্মীরি মুসলমানেরা। ৪৭-এর পর থেকে ভারতীয় দখলদারির মুকাবেলায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে তারা মুখ্য হিসেবে বিবেচনা করে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করলেও দীর্ঘ দিন এ পন্থায় সংগ্রাম অব্যাহত রেখে ভারতীয় চক্রান্ত ও নাটকীয়তার কাছে তাদের হার মানতে হয়েছে। স্বায়ত্তশাসনের বিধান থাকলেও পাতানো ও ব্যাপক কারচুপিমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে দিল্লি বারবার জম্মু-কাশ্মীরের সর্বময় ক্ষমতা নিজেদের আজ্ঞাবহ লোকদের হাতেই রেখেছে। তাই ইসরায়েলি আগ্রাসনের মুকাবেলায় ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ আন্দোলন ‘ইন্তিফাদা’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কাশ্মীরের জনগণ ১৯৮৯ সালে ব্যাপকভাবে প্রতিরোধ আন্দোলনে নামে।

আর এ প্রতিরোধেই তাদেরকে সময়ে সময়ে অসংখ্য প্রাণ ও রক্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে। নির্মমভাবে ধর্ষিতা হতে হয়েছে কাশ্মীরী নারীদের।

১৯৯০ সালের ১৯ জানুয়ারি কাশ্মীরিদের ইন্তেফাদা দমানোর লক্ষ্যে চরম মুসলিম-বিদ্বেষী জগমোহনকে কাশ্মীরের নতুন গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেয় দিল্লি। জগমোহন তাঁর নিয়োগের দিন রাতেই কাশ্মীরে জঙ্গি-বিরোধী অভিযানের নামে সামরিক বাহিনী দিয়ে সাঁড়াশি তল্লাশি চালান। এতে গ্রেপ্তার করা হয় প্রায় ৩০০ কাশ্মীরিকে। ফলে পরদিন দিনের বেলায় জগমোহনকে যখন গভর্নরের শপথবাক্য পাঠ করানো হচ্ছিল, নিরস্ত্র কাশ্মীরিরা কারফিউ অমান্য করে প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে। বিক্ষোভকারীরা যখন ঝিলাম নদীর উপরে অবস্থিত গাওয়াকাদাল ব্রিজের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, ভারতীয় প্যারামিলিটারি বাহিনী ব্রিজের উভয় পারে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালায়। বেশিরভাগ বিক্ষোভকারী গুলির আঘাতে শাহাদাতবরণ করেন, কেউ কেউ গুলি থেকে বাঁচতে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে শহিদ হন। এই ঘটনায় ১০০-এর উপর কাশ্মীরি শাহাদাতবরণ করেন।

প্রতিরোধ সংগ্রামে ভারতীয় বাহিনীদের হাতে এমন আরও কত নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কাশ্মীরিরা, তার হিসেব হয়তো কারও কাছেই নেই। কুখ্যাত কয়েকটি নির্মমতার ঘটনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

যাকুরা ও টেংপোরা হত্যাকান্ড : বিক্ষোভকারীরা কাশ্মীরের স্বাধীনতা প্রশ্নে জাতিসংঘের রেজুলেশন অনুযায়ী গণভোটের আয়োজনের দাবিতে ১৯৯০-এর পহেলা মার্চ যাকুরা শ্রীনগরের ক্রসিং ও টেংপোরা বাইপাস রোডে জমায়েত হলে ভারতীয় হানাদার বাহিনী তাদের উপর গুলি চালায়। এতে ৩৩ জন নিহত ও ৪৭ জন আহত হন।

কুনান পুশপুরা গণধর্ষণ : ১৯৯১-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে ভারতীয় হানাদার বাহিনী কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার কুনান পুশপুরা গ্রামে তল্লাশি চালায়। গ্রামের পুরুষদের এক জায়গায় জড়ো করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘরে ঘরে ঢুকে মহিলাদের গণধর্ষণ করে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে, ১০০-এর উপর মহিলা সেদিন নির্মম

ধর্ষণ-যজ্ঞের শিকার হন।

লাল চৌক অগ্নিকাণ্ড : জনগণ কর্তৃক বিএসএফের কিছু পরিত্যক্ত দালান জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রতিশোধ স্বরূপ বিএসএফ শ্রীনগরের লাল চৌকে জনবসতিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মানুষ পালাতে যাওয়ার সময় বিএসএফ গুলি চালায়। ফলে ১২৫ জন নিরীহ মানুষ নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন।

বিজবেহারা হত্যাকাণ্ড : ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক হযরতবাল মসজিদ অবরোধের প্রতিবাদে ১৯৯৩-এর ২২ অক্টোবর বিজবেহারাতে আয়োজিত বিক্ষোভে বিএসএফের ৭৪ নং ব্যাটেলিয়ন গুলি চালায়। এতে ৫১ জন নিহত এবং ২০০ জন আহত হন।

সোপুর হত্যাকান্ড : কাশ্মীরের বারোমোল্লা জেলার সোপুর থানায় বিএসএফ ও জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের যোদ্ধাদের মধ্যে গোলাগুলির সময় বিএসএফ আশেপাশে বিভিন্ন ভবনে আগুন ধরিয়ে, যানবাহনে হামলা চালিয়ে এবং নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলি চালিয়ে প্রায় ৫৫ জন নিরস্ত্র কাশ্মীরিকে হত্যা করে।

বান্দীপোড়া হত্যাকান্ড : ১৯৯৩ সালের ২৭ অক্টোবরে বান্দীপোড়ায় কালো দিবস পালন করার সময় গুলি করে ১৯জন কাশ্মীরিকে শহিদ করা হয়।

২০০৪ থেকে ২০০৭ সালড়এই সময়টায় নানা প্রতিবন্ধকতায় কাশ্মীরিদের প্রতিরোধ-সংগ্রাম খানিকটা ঝিমিয়ে পড়লেও ২০০৮ সালে আবার তা পূর্ণ উদ্যমে জেগে ওঠে। কাশ্মীরের প্রায় একশত একর জমি অমরনাথ তীর্থস্থান বোর্ডকে (যেটি কাশ্মীরে অমরনাথ তীর্থস্থানের দেখভালের জন্য নিয়োজিত ছিল) দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কাশ্মীরি মুসলিমরা ব্যাপারটিকে জম্মু-কাশ্মীরের বাইরে থেকে হিন্দু এনে কাশ্মীরের মধ্যে হিন্দু জনবসতি গড়ে ইসরায়েলি কায়দায় কাশ্মীরের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেমোগ্রাফি পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখতে থাকে এবং এর প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এ উপলক্ষে কাশ্মীরের সবচেয়ে বড় জনসভায় প্রায় ৫ লাখ মানুষ জড়ো হয়, যা কাশ্মীরের ইতিহাসে ছিল সর্ববৃহৎ জনসমাবেশ। এ সময় বিভিন্ন জায়গায় ভারতীয় হানাদার বাহিনীর হাতে ৬০ জন কাশ্মীরি গুলিবিদ্ধ হন।

২০১০ সালে ভারতীয় হানাদার বাহিনী বারোমোল্লা জেলার নাদিহাল গ্রাম থেকে তিনজন যুবককে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং পরে সাজানো অ্যানকাউন্টারে হত্যা করে। পরে এ তিনজনকে পাকিস্তান থেকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। এ হত্যাকাণ্ড কাশ্মীরে আবারও গণবিক্ষোভের সূচনা করে। এবারের গণবিক্ষোভে প্রায় ১২০ জন কাশ্মীরি বিক্ষোভকারীকে হত্যা করে ভারতীয় হানাদার বাহিনী।

২০১৬ সালে কাশ্মীরের তরুণ মুক্তিযোদ্ধা হিজবুল মুজাহিদীন কমান্ডার বুরহান ওয়ানি তাঁর দুজন সঙ্গীসহ ত্রালে ভারতীয় হানাদার বাহিনীর হাতে গোলাগুলি বিনিময়ের সময় শাহাদাত বরণ করেন। বুরহান ওয়ানি তাঁর তারুণ্য, সাহস এবং বীরত্বের জন্য শাহাদাতের আগেই কাশ্মীরের ঘরে ঘরে উচ্চারিত একটি নাম হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর শাহাদাত কাশ্মীরে নজিরবিহীন বিক্ষোভ উস্কে দেয়। শুধুমাত্র তাঁর জানাযাতেই কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২ লক্ষ লোকের সমাগম ঘটে।

২০১৬-এর শেষের দিকে শুরু হওয়া গণজাগরণ ও বিক্ষোভ ছিল কাশ্মীরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় গণজাগরণ এবং এর উপর ভারতীয় হানাদার বাহিনীর চালানো দমন-নিপীড়নও ছিল নজিরবিহীন। ১০০-এরও বেশি বিক্ষোভকারী নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে শহিদ হন আর আহত হন ১৫ হাজারেরও বেশি। এই গণজাগরণের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, বিক্ষোভ দমনে হানাদার বাহিনী পেলেট বন্দুক ব্যবহার করে। পেলেট গান হচ্ছে শটগানের মতই, যা থেকে গুচ্ছাকারে ধাতব শার্পনেল নিক্ষেপ করা হয়। হাজার হাজার বিক্ষোভকারী পেলেটবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হয়েছেন, যাদের অনেককেই পরবর্তী সময়ে স্থায়ী চেহারা বিকৃতি এবং অন্ধত্ব বরণ করে নিতে হয়েছে।

কিন্তু এত কিছুর পরও কাশ্মীরিদের প্রতিরোধ-সংগ্রাম থেমে নেই। বরং দিনদিন তাঁরা আরও গোছালো, আরও পরিপক্ক হয়ে উঠছেন ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। একসময় আদর্শিক মতানৈক্য এসব সংগ্রামীর মধ্যে বিভেদ ছড়িয়ে দিলেও বর্তমানে সেটা আর নেই। তরুণ প্রজন্মের সংগ্রামী যাঁরাই এ পথ বেছে নিচ্ছেন, ইসলামকে নিজেদের অনুপ্রেরণায় জায়গায় রাখছেন, এবং মতাদর্শ হিসেবে ইসলামকে অবলম্বন করে লড়ে যাচ্ছেন ইতিহাসের অসম এক লড়াই। যে লড়াই থেকে অনেক কিছুই শেখার আছে আজকের পৃথিবীর।



কাশ্মীরিদের জীবনযন্ত্রণা : প্রিয়জন যখন কারারুদ্ধ

রাকিবুল হাসান

আগ্রার কেন্দ্রীয় কারাগারের বারান্দায় স্টিলের টুলে বসে আছেন ৭০ বছর বয়সী হামিদা বেগম। ভারতের জবর দখলে থাকা কাশ্মীরের হিমালয় অঞ্চল থেকে ৯৬৫ কিলোমিটার (৬০০ মাইল) পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছেন তিনি। মুখের প্রতিটি ভাঁজে ক্লান্তির করুণ দাগ। তবুও ভেঙে পড়ছেন না, সটান বসে আছেন। এত দূর শহরে এসে হারিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, তবে তাঁরই মতো আরেক হতভাগ্য গওহার মাল্লার সঙ্গে দেখা হওয়াতে ভাগ্যিস বেঁচে গেছেন। এখানে এসে দেখেন আরও অনেকেই বসে আছে মনমরা হয়ে, অপেক্ষার প্রহর গুণতে গুণতে তিক্ত হয়ে। তাঁরা সবাই এসেছেন কাশ্মীরে আটক হওয়া তাদের আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে। হামিদা বেগম এসেছেন তাঁর ছেলেকে দেখতে।
২০ বছরের এক তরুণ হামিদা বেগমের সামনে একটি পানির বোতল এগিয়ে ধরল। হামিদা বেগম পানিটা হাতে নিলে তরুণটি বলল, নিরাশ হবেন না। আপনি একা নন। ছেলের দেখা অবশ্যই পাবেন। হামিদা বেগম আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন, আল্লাহ আমাদের ধৈর্য দিন।
হামিদা বেগমের বড্ড মনে পড়ে, সেই কারাগারের বারান্দায় বসে থেকে, গত ৫ আগস্টের একটি ভয়কাতর সকালের কথা। ভারতীয় সেনারা ঘরে এসে টানতে টানতে নিয়ে গেল ছেলেকে। ছেলের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। টানা দশদিন কাশ্মীরের বিভিন্ন কারাগারে দৌড়ালেন, এমনকি পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের কারাগারগুলোতেও। চোখের সামনে থেকে এমন নির্দয়ভাবে টেনে নিয়ে গেলো, এখন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তার মনে তখন ঝড় বইছে। মাঝেমধ্যে ছেলের শহিদ হয়ে যাওয়ার কল্পনাও দানা বাঁধছে। ঠিক এমন সময় খবর নিয়ে এল এক আগন্তুক, 'আপনার ছেলে আগ্রার জেলে আছে।'
ছেলেকে দেখার জন্য ৬০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছেন। অবশেষে অপেক্ষার প্রহর শেষ হলো। তাঁর ডাক পড়ল ভেতরে। ১৫-২০ মিনিট পর ভেতর থেকে বাইরে এসে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন হামিদা বেগম। সুখের আবরণে কেমন মুখের ক্লান্তির দাগ মুছে গেছে। তিনি বললেন, 'আমি এখন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। আমার ছেলেকে যখন দেখলাম–আমার মনে হলো আজ আমার ঈদ। আমি তো একজন মা। কতদিন পর দেখলাম আমার ছেলেটাকে।'

দুই
হামিদা বেগম যাঁর সাহায্যে পথ চিনে এসেছেন, সেই গওহার মাল্লাও পরিবার নিয়ে এসেছেন কেন্দ্রীয় কারাগারে বোন-জামাই আমির পারভেজকে দেখতে। ৬ আগস্ট সকালে তাঁকে ভারতীয় সেনারা ধরে নিয়ে যায়। এতদিন কাশ্মীরের বিভিন্ন কারাগারে আটকে রাখার পর

এখন পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে কাশ্মীরের বাইরে আগ্রায়।

এক হাজার ডলার ঋণ করে তিনি বোন-জামাইকে দেখতে এসেছেন। বোন-জামাইকে দেখে যখন রুম থেকে বেরোলেন, কী অদ্ভুত এক প্রশান্তি খেলা করছিল তাঁর মুখের চাহনিতে।

আবেগ-উদ্বেলিত কণ্ঠে তিনিও বললেন, 'তাকে দেখার পর আমার মনে হয়েছে পুরো পৃথিবী হাতের মুঠোয় পেয়েছি। টাকা গেছে যাক।'

আমির পারভেজের স্ত্রী মরিয়ম রসূল স্বামীর কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কান্নাভেজা কণ্ঠেই বললেন, 'প্রচণ্ড গরমের কারণে তাঁর মুখ ফুলে গেছে। আমরা একে অপরকে জড়িয়ে কান্না করেছি। এই গুমোট পরিবেশে তাঁকে যদি বেশিদিন রাখা হয়, তাহলে তাঁকে বাঁচানো কঠিন হয়ে যাবে।' মরিয়মের শ্বাশুড়ি আচল দিয়ে বৌয়ের চোখের জল মুছে দিচ্ছেন। এদিকে মরিয়ম তাঁর উষ্ণ মমতার বুকে জড়িয়ে রেখেছেন তাঁর পাঁচ বছরের ছেলেকে। সে হয়তো ঠিক বুঝতে পারছে না তাঁর মায়ের যন্ত্রণাদগ্ধ কান্নার কারণ।

তিন

আশরাফ মালেকের হাতে কিছু ডকুমেন্টস। তিনি কারাগারের এখানে-সেখানে দৌড়াদৌড়ি করছেন। তাঁর ছেলে আসিফ আশরাফ আগ্রার এই কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক। আগস্টের সেই থমথমে সময়ে তিনটি গুলি বিদ্ধ হয় আসিফের পেটে। কেবল আল্লাহর ইচ্ছায় বেঁচে গেছে। কিন্তু এটাকে বেঁচে যাওয়া বলে? হাসপাতালের বেড থেকেই তাকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। বুলেটের ক্ষত এখনো সারেনি যার, তাকেও জেলে পুরে দিয়েছে ভারত। মালেকের প্রশ্ন–'আর কোনো দেশ এতটা নৃশংসতা দেখিয়েছে?'

চার

গত ৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার দেশটির জবর দখলে থাকা জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা সম্বলিত ৩৭০ ধারা বাতিল করে দেয়। সেই সঙ্গে কাশ্মীরি জনগণের বিক্ষোভ দমাতে বন্ধ করে দেয় কাশ্মীরের মোবাইল-ইন্টারনেট পরিষেবাসহ যাবতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েট প্রেস নিউজ অ্যাজেন্সির এক প্রতিবেদন মতে বিশেষ মর্যাদা বাতিলের এক মাসের মাথায় চার সহস্রাধিক কাশ্মীরিকে গ্রেপ্তার করেছে ভারতীয় হানাদার বাহিনী। এদের মধ্যে অধিকাংশই যুবক। ইতিমধ্যে প্রায় তিন হাজার যুবককে মুক্তি দেয়া হয়েছে। কিন্তু আড়াইশ যুবককে কাশ্মীরের বাইরে বিভিন্ন কারাগারে পাঠানো হয়েছে। জননিরাপত্তা আইনে তিনশ জনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। এতে তারা দুই বছর বিনা বিচারে আটক থাকবে কারাগারে।

বহু বছর ধরেই মানবাধিকার সংস্থাগুলো ভারতীয় সেনাদের বিরুদ্ধে কাশ্মীরি জনগণকে শারীরিক ও যৌন নির্যাতন এবং অযৌক্তিকভাবে গ্রেপ্তারের অভিযোগ করে আসছে। কিন্তু বরাবরই এই অভিযোগ চতুরতার সাথে এড়িয়ে গেছে ভারত। বলেছে, এগুলো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অপপ্রচার। তারা স্বাধীনতা চায় বা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়।

চল্লিশের দশকের শেষদিক থেকেই কাশ্মীর সমস্যাটির শুরু। মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, ১৯৮৯ সালে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর এই পর্যন্ত কাশ্মীরের ৭০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। গ্রেপ্তার কত, তার কোনো হিসেব নেই। ৫ আগস্টের পর উপত্যকার পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গেছে।

কাশ্মীর কিংবা বাইরের কারাগারগুলোতে সাক্ষাৎপ্রার্থী স্বজনদের ভিড়। কেউ এসেছে বাবার সঙ্গে দেখা করতে, কেউ স্বামীর সঙ্গে, কেউ ভাইয়ের সঙ্গে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ১৫-২০ মিনিট সময়ের জন্য দেখা করার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু ঠিকমতো কথাও বলা যায় না। কারাকর্তৃপক্ষ তাদেরকে তাড়াতাড়ি বের করে দেয়।

৬০০ মাইল পাড়ি দিয়ে আরও কত হামিদা বানু ছেলের সঙ্গে এক পলক দেখা করতে আসেন, কিন্তু মনভরে কথাও বলতে পারেন না। ফিরে আসতে হয় হানাদার বাহিনীর তাড়ায়। তখন হয়তো ছেলেটা চোখের জলে মাকে বিদায় দিয়েই বলে, 'চলে যাও মা। ওরা ভালো না। আমি অচিরেই ফিরে আসব।'

কাশ্মীর এখন অজানা অচেনা এক আতঙ্কেও উপত্যকা। গ্রেপ্তারের যেমন নিয়ম-নীতি নেই, তেমনি নেই ছাড়া পাবার কোনো কানুনও। প্রিয়জনদের কারাগারে রেখে কাশ্মীরি স্বজনরা পার করছেন যন্ত্রণাদগ্ধ এক সময়। কবে আসবে আজাদি, ভারতীয় আগ্রাসনের এই কালো থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য কবে আসবেন একজন বিপ্লবী শাহসওয়ার, সেই ইন্তেজারেই কাটছে প্রতিটা কাশ্মীরির অপেক্ষার প্রহর।



(কাশ্মীরের সফরনামা)

লুলাব ভ্যালির ডায়েরি

হুজাইফা মাহমুদ

আমরা কুপওয়ারা জেলার হান্দওয়ারা এলাকায় দুদিন যাবত আটকা পড়ে আছি। না পারছি আমাদের গন্তব্য লুলাবের দিকে যেতে, না পারছি ঘরে ফিরতে। আমার কাশ্মীরি বন্ধু সায়েম ভাই, এই সফরে যিনি আমার মূল মেজবান এবং সাথি, তাঁর বন্ধু ও ক্লাসমেট শাফকাত ওয়ানির বাড়িতে অবস্থান করছি এখন। আমরা মূলত বের হয়েছিলাম লুলাব ভ্যালির উদ্দেশে। এটা কুপওয়ারা জেলার একদম শেষ দিকে, পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত। টাঙমার্গ ও গুলমার্গ থেকে প্রায় সত্তর কিলোমিটার দূরে। আমাদের পরিকল্পনা ছিল প্রথম দিন আমরা শাফকাত ভাইদের বাড়িতে গিয়ে অবস্থান করব, দ্বিতীয় দিন সেখান থেকে লুলাব গিয়ে সেদিনই ফিরে যাবো ঘরে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর ভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম। হান্দওয়ারা পর্যন্ত যাওয়ার পথেই আমরা কিছুটা টের পেয়েছিলাম অবশ্য। বার বার চেকিংয়ের সম্মুখীন হয়ে আমাদের অবস্থা নাজেহাল। এতটুকু রাস্তা অতিক্রম করতে গিয়ে অন্তত পাঁচবার গাড়ি থেকে নামতে হয়েছে চেকিংয়ের জন্য। বারবার জবাবদিহিতা করতে হয়েছে, কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কোথা থেকে এসেছি, আমার সাথে তার কী সম্পর্ক, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে আমি বেশ দমে গেলাম। বিশ্রী শয়তানরূপী ফৌজিদের দেখলেই ভয়ে আমার চোখ-মুখ শুকিয়ে যায়। সায়েম ভাই আমাকে সাহস দেন–'ইয়ার, ডরনে কি কুই বাত নেহি! ইন সালৌ নে হামকো কুছ নেহি করেঙ্গে, খামোখা তঙ্গ কররাহা হ্যায়!'

শাফকাত ভাইদের বাড়িতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিকাল প্রায় শেষ। তাপমাত্রা ঝুপ করে শূন্যের নিচে নেমে গেছে। তাঁরা আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। আক্ষরিক অর্থেই উষ্ণ। ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসা মাত্রই কম্বল আর কাঙড়ি এনে দেয়া হলো। কম্বলের নিচে কাঙড়ি দিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণের মাঝেই শীতকে আমরা কাবু করে ফেলতে পারলাম। তারপর হরেক রকম নাস্তার আয়োজন। সারাদিনের সফরের ক্লান্তি আর সশস্ত্র পশুদের হয়রানির ধকল মুহূর্তেই উবে গেলো তাঁদের অতিশয় মানবিক আচরণে। আমরা বেশ ফুরফুরে মেজাজে বসে গল্পগুজব করছি। রাতের খাবার দাবার শেষ কওে শোবার প্রস্তুতি নিচ্ছি যখন, তখন সংবাদ আসলো কুপওয়ারা টাউনে ভয়াবহ

গোলাগুলি হয়ছে। এতে তিনজন মুজাহিদ শহিদ ও একজন ফৌজির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থল এখান থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে। একটু আগের ফুরফুরে ভাবটা কেটে গেছে। সকলের চেহারায় ফুটে উঠেছে দুশ্চিন্তার ছাপ। আমরা বুঝে গেলাম, কাল আর কোথাও যাওয়া হচ্ছে না আমাদের!

পরদিন সকালে দেখা গেল চারদিকে থমথমে ভাব। রাস্তাঘাট ফাঁকা। সাঁজোয়া যানের বহর দেখা যায় শুধু। আমরা যেখানে আছি সেটা গ্রাম-এলাকা, মেইনরোড থেকে বেশ দূরে। একটি পাহাড়ের ঢালুতে ঘরগুলো সুন্দর করে সাজানো। আমাদের ঘরটি বলতে গেলে প্রায় পাহাড়ের পেটের ভেতরে। পাহাড়টি হালকা তুষারে আবৃত। চারদিকে আপেল বাগান। বাগানের মাঝখানে ঘর। শীতকালে অবশ্য বাগানের কঙ্কালটি রয়ে যায় শুধু। কোনো গাছে একটা পাতাও অবশিষ্ট নাই। পাহাড়ের চূড়ার দিকটা ঘন দেবদারু গাছে ঢাকা। এগুলো অবশ্য বারো মাসই সবুজ থাকে, পাতা ঝরে না।

রাতেই শাফকাত ভাইয়ের বাবার সাথে আমার বেশ খাতির জমে যায়। ফজরের সময় শীতে কাঁপতে কাঁপতে একসাথে মসজিদে গেলাম। সকাল ১০টার দিকে সামান্য রোদের দেখা মিলল। আমরা কাঙড়ি হাতে নিয়ে হাঁটতে বের হলাম। তাঁর বয়স প্রায় ৬০। সিনিয়র ফরেস্ট অফিসার হিসেবে রিটায়ার করেছেন কিছুদিন আগে। উচ্চ শিক্ষিত লোক, জানাশোনার পরিধিও বেশ ব্যাপক। আমরা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে উঠি আর নামি, আর গুজুরগুজুর করে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করতে থাকি। আলোচনার মূখ্য বিষয় থাকে কাশ্মীরের ইতিহাস, তাঁদের সংগ্রামের ইতিহাস। তিনি ভরাট কণ্ঠে বলে যান, 'জনাব য়েহা আভি জো হালত চল রাহি হ্যায়...'

টানা দুইটা দিন এভাবেই কাটে। নামাজের সময় একসাথে নামাজে যাই। তিনি লোকজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন–'আমার মেহমান, দেওবন্দ থেকে এসেছে!' বয়স্ক মানুষগুলোর চেহারা আন্তরিক হাসিতে উপচে পড়ে। কেউ কেউ মুসাফাহার পাশাপাশি বুকেও জড়িয়ে ধরেন। সেখানকার রীতি হলো মাগরিবের নামাজের পর থেকে এশা পর্যন্ত সবাই একসাথে বসে গল্পগুজব করেন। এশার নামাজের পরে বাড়ি ফেরেন। এই সময়টা আমি খুব উপভোগ করতাম। অধিকাংশই বয়স্ক। তাঁরা বিচিত্র বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। কাশ্মীরিরা পরস্পরে সবসময় নিজ ভাষাতেই কথা বলেন। এখানেও প্রথমে তাঁরা কাশ্মীরি ভাষাতেই কথা বলছিলেন, পরে একজন বললেন, 'আমাদের মেহমান তো এই ভাষা বোঝেন না, আমরা বরং উর্দুতেই কথা বলি।' সবাই একবাক্যে তা মেনে নিলেন। এই প্রস্তাবটি যিনি করেছেন তিনি একজন যুবক, নামাজের আগে তাঁর সাথে পরিচয় হয়েছিল। আমার দিকে তাকিয়ে প্রাণখোলা একটা হাসি দিলেন। আর আমার মুখে তো আনন্দ ও বিস্ময়ের হাসি সবসময় লেগেই আছে।

এখান থেকেই লুলাবের বিশাল পাহাড়গুলো চোখে পড়ে। আমি পরম বিস্ময়ে সেইসব পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে উথাল-পাতাল কতকিছু ভাবি! কোনোদিনও কি ভেবেছিলাম, এইসব স্বর্গীয় উপত্যকায় একদিন আমিও উদ্ভ্রান্তের মতো মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াবো! একসময় রহস্যপত্রিকায় ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনি খুব আগ্রহ নিয়ে নিয়মিত পড়তাম। তখন এরকম অনেক কাহিনির বর্ণনা পেয়েছি, ইবনে বতুতা পৃথিবীর কোথাও কোনো অজানা প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আবার মাঝে মাঝে কোথাও কোনো দুর্যোগে এভাবে আটকাও পড়ে যাচ্ছেন। নিজেকে আমার ইবনে বতুতা ইবনে বতুতা মনে হতে লাগলো এবং এতে বেশ আমোদিত হলাম। এই অচেনা উপত্যকায় দিন দুয়েক আটকা পড়ে থেকে আমার একবিন্দুও খারাপ লাগেনি। জীবনের সেরা সময়গুলোর মাঝে এখানে, এই টুমপুরা উপত্যকায় কাটানো দুটি দিনও থাকবে। শাফকাত ভাইয়ের পরিবারটিও আমার হৃদয়ে জায়গা করে নেবে আজীবন। আমি চাচাকে একবার বলেছিলাম, 'আপনাদের এই অসাধারণ মেহমানদারির সাথে আমাদের পূর্বপরিচয় নাই, আর কোথাও এমনটা পাইনি। বিস্ময়কর লাগে।' তিনি বললেন, 'এ আর তেমন কী দেখেছ? আজ থেকে ১৫-১৬ বছর আগেও আমরা আরও শতগুণ বেশি অতিথিপরায়ণ ছিলাম। কিন্তু মাঝে দীর্ঘ একটা সময় এমন গেছে যে, আমাদেরকে মেহমানদারি জিনিসটাই ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। কোনো বাড়িতে অতিথি পাওয়া গেলে আগে অতিথিকে পেটানো হতো, তারপর ঘরওয়ালাদের। এমনকি আপন ভাইও তার ভাইয়ের বাড়িতে যেতে পারত না। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছি খুব বেশিদিন হয়নি। ফলে আমাদের মাঝে আর আগের অবস্থাটি নেই।'

পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভবিক হওয়ায়, তৃতীয়দিন সকালে আমরা লুলাবের উদ্দেশে রওয়ানা করলাম। সাথে শাফকাত ভাইও যোগ দিয়েছেন। আবহাওয়া স্বাভাবিক লাগছে না। সূর্য ওঠে নাই। ঠাণ্ডাও বেশি লাগছে না, গুমোট, ভারী আবহাওয়া। সায়েম ভাই বললেন, 'অবস্থা তো সুবিধাজনক না, তুষারপাত শুরু হয়ে যেতে পারে।' এই কথাতে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কে হবে!

খারাপ আবহাওয়ার আশঙ্কা-সহই আমরা তিনজন লুলাব ভ্যালির উদ্দেশে রওয়ানা করলাম। লুলাব হলো কাশ্মীরের অত্যাশ্চর্য সুন্দর যে কয়টি উপত্যকা আছে তার মাঝে অন্যতম সুন্দর। লুলাব ভ্যালি 'ল্যান্ড অব লাভ অ্যান্ড বিউটি' নামেও বিখ্যাত। এবং ফ্রুট বেসিন অব কাশ্মীর। ফলমুল এখানেই সবচেয়ে বেশি হয়। অসংখ্য পাহাড়ি ঝর্ণা এবং নালা বয়ে গেছে উপত্যকার চারপাশ দিয়ে। ঘন পাইন এবং দেবদারু গাছের বন সমস্ত পাহাড়জুড়ে। মূল তিনটি অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে ত্রিকৌণিক তিনটি উপত্যকা। এগুলোর সম্মিলিত নাম হলো লুলাব ভ্যালি। অঞ্চল তিনটির নাম হলো লালপুরা, সাগোম এবং ওয়ারনাভ। আমাদের গন্তব্য ওয়ারনাভে।

কুপওয়ারা মূল শহর থেকে আরও ২০-২৫ কিলোমিটার দূরে। আমাদের গাড়ি চলছে এক থমথমে পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে। দুই দিন আগের অ্যানকাউন্টার অ্যাটাকের প্রভাব এখনো বিদ্যমান। রাস্তায় লোকজন বেশি নাই। গাড়িগুলো ঢিমে তালে চলছে। কিছুদূর পরপর চেকপোস্ট। প্রতিবার চেকিংয়ের সময় সবাইকে গাড়ি থেকে নামতে হয়। আইডেন্টিটি নিশ্চিত করতে হয়। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কার কাছে যাচ্ছি–সেসব প্রশ্নের জবাবও দিতে হয়। লুলাবে আমাদের নির্ধারিত কোনো ঠিকানা নাই, তাই রাস্তায় বেরোনোর পূর্বেই একটা ঠিকানা ঠিক করে নিয়েছিলাম–লুলাব মারকাজ মসজিদে ওয়াজ শুনতে যাচ্ছি! এই উত্তরই দিলাম প্রতিবার। পরে অবশ্য লুলাব গিয়ে জানতে পেরেছি এখানে কোনো মারকাজ মসজিদই নেই, মারকাজ মসজিদ হলো কুপওয়ারা মেইন টাউনে!

কুপওয়ারা থেকে লুলাব যাওয়ার রাস্তাটা আজীবন মনে থাকার মতো। পুরোটা পথ পাহাড়ের উপর দিয়ে উঠেছে এবং নিচের উপত্যকা সাদা তুষারের নিচে আবৃত। লুলাব ভ্যালিতে প্রবেশের জন্য রাস্তায় সুন্দর একটি তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। উপরে লেখা–'ওয়েলকাম টু লুলাব ভ্যালি। লোজ ইউরসেল্ফ ইন দ্যা মিডোজ অব লুলাব, ফাইন্ড পিস অ্যান্ড সলিচিউড।' কথাগুলো পড়ে কিছুটা হাসিই পেলো। চারদিকে যেভাবে গিজ গিজ করছে সামরিক জান্তারা, তাতে পিস না পেলে সলিচিউড পাওয়া যাবে আলবৎ! কাশ্মীরি কবি আগা শহিদ আলির কবিতার একটি লাইন মনে এলো আমার, they make a desolation and call it peace! যুগযুগ ধরে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে এই রূঢ় উপহাসটা করা হচ্ছে কাশ্মীরীদের সাথে!

আরেকটু সামনে একটা সাইনবোর্ডে লেখা আছে–'এক্সপ্লোর আল্লামা'স লুলাব'। এই আল্লামা কে, সেটা বলবো। আমরাও মূলত এই আল্লামার দরবারেই যাচ্ছি। এই আল্লামাকে উৎসর্গ করে আরেক আল্লামা, কবি ইকবাল একটি কবিতা লিখেছিলেন। সেই কবিতাটিও এখানকার সাইনবোর্ডে শোভা পাচ্ছে। কবিতার প্রথম দুই-তিন লাইনের অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায় তা হলো–

'তোমার ঝর্ণার জল যেন উত্তপ্ত সিসার মতো উথলায়
তোমার বায়ুমন্ডলে অস্থির উড্ডীন মরুচারী বিহঙ্গ
হে লুলাব উপত্যকা, হে লুলাব উপত্যকা!'

কবিতাটি আরও লম্বা। পুরোটা অনুবাদ করে দেওয়ার সুযোগ নাই।

অবশেষে আমরা ওয়ারনাভ এলাকায় এসে পৌঁছালাম। হার্টবিট বন্ধ করে দেওয়ার মতো সুন্দর এলাকাটি। পাহাড়গুলো বরফাবৃত। আর ঘন দেবদারু বন অলৌকিক সবুজ সাজে সজ্জিত হয়ে আছে। এই এলাকার নাম পূর্বে 'দুধওয়ান' ছিল। কাশ্মীরি ভাষায় 'দুধওয়ান' মানে দুধভর্তি জঙ্গল। কী অদ্ভুত মপটাফরিক্যাল নাম! পরবর্তীতে একজনের কাছ থেকে এর নামকরণের কারণ জেনেছি। মূলত এই অঞ্চলের চারণভূমিগুলোর ঘাস সবচেয়ে বেশি ঘন এবং পুষ্টিকর হয়। ফলে এখানকার দুধেল পশুগুলিও অত্যধিক দুধ দেয়। এই দুধের জঙ্গল থেকেই উৎসারিত হয়েছিল আরেকটি দুধের ঝর্ণা। যে ঝর্ণার দুধে বিগত দেড়শত বছরের মুসলিম জাহান, বিশেষ করে উপমহাদেশের ইসলামি জ্ঞানমহল, সিক্ত হয়েছে এবং তৃপ্ত হয়েছে। যে ঝর্ণাটির কথা বলছি তাঁর নাম সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলায়হি। তিনিই সেই আল্লামা, যাঁকে নিয়ে ইকবাল কবিতা

রচেছেন, আর সাইনবোর্ডের নির্দেশনা, এক্সপ্লোর আল্লামা'স লুলাব। এই দুধওয়ানেরই কৃতি সন্তান! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দুধকে জ্ঞানের রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এক হাদিসে বলেছেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি একটা পাত্রে দুধ পান করছি এবং পাত্রের অবশিষ্ট দুধ উমরকে পান করতে দিয়েছি।' এর অর্থ হলো, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় উমর পরের অবস্থানে থাকবেন। আমাদের বর্ণিত ব্যক্তিটি ছিলেন তেমনই এক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উচ্ছল জীবন্ত প্রস্রবণ! ইসলামি জ্ঞানের সাথে সামান্য সম্পর্ক থাকা ব্যক্তিটিও আশা করি এর সত্যতা অনুভব করবেন।
আমরা শাহ সাহেবের গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। মহল্লার নাম 'আনওয়ারাবাদ'। একটা জামে মসজিদ আছে এখানে, মসজিদে আনওয়ার। আমরা সেখানে এসে জোহরের নামাজ পড়লাম। পাশেই মাদরাসা। এটি শাহ সাহেব নিজে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর মায়ের ইন্তেকালের পরে তিনি দীর্ঘ তিনবছর এখানেই কাটিয়েছিলেন। সেসময়কার প্রতিষ্ঠিত এই মাদরাসা। প্রধান ফটকের নাম, বাবে আনওয়ার। এই উপত্যকার প্রতিটি প্রাণকে তিনি এক আশ্চর্য মগ্নতায় ফেলে রেখে গেছেন, যে কারণে প্রতিটি পদে পদে আপনি তাঁর দেড়শো বছরের পুরাতন অস্তিত্ব এক অদ্ভুত সজীবতায় টের পাবেন। এখানকার অধিকাংশ মানুষ নামাজি। নামাজের ওয়াক্তগুলোতে মসজিদ কানায় কানায় ভরে যায়।
শাহ সাহেবের চাচার দিকের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাঁরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন। দুপুরের খাবার-দাবার তাঁদের বাড়িতেই সারলাম। তারপর তাঁদের পারিবারিক কবরস্তানে গেলাম। এখানে শাহ সাহেব নেই, তিনি দেওবন্দের মাজারে আনওয়ারিতে শায়িত। তাঁর বাবা মৌলানা মোয়াজ্জম শাহ এবং তাঁর মায়ের কবরসহ তাঁদের বংশের আরও অনেক বুজুর্গের কবর এখানে। পাশেই মাসুদ শাহ কাশ্মীরির মাজার। তিনি আল্লামার পরদাদা ছিলেন, তখনকার সময়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব।
কবর জিয়ারত শেষে আমরা শাহ সাহেবের বাড়ি দেখতে গেলাম। একেবারেই সাদামাটা ছোটখাটো একটি দুতলা বাড়ি। দুইশ' বছরের প্রাচীন এই ঘর। ঘরটির দিকে তাকিয়ে কল্পনায় কতকিছু দেখছিলাম! শাহ সাহেব দেওবন্দের ছাত্র, এবং পরবর্তীকালের শিক্ষক। আমিও সেই দেওবন্দেরই এক ভবঘুরে নাদান! থাক না আমাদের মধ্যকার দিন-রাতের বিশাল ফারাক, তবুও তো আমাদের মাঝে আছে এক আশ্চর্য মিল! আমরা পরস্পরে আত্মার আত্মীয়! শাহ সাহেবের মেহমান হয়ে এসেছি আমি, তিনি বাড়ি নেই। থাকলে নিশ্চয় মেহমানদারির কোনো কমতি করতেন না! যেমন তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা করছেন না। 'ফায়জুল বারী' পড়ার সময় কত জায়গা যে বুঝি নাই, তাঁর কত প্রজ্ঞার বাণী আমাদের ঠুনকো মেধা বুঝে উঠতে পারেনি। তিনি থাকলে সেগুলো একে একে প্রশ্ন করে বুঝে নিতাম!
ঘুরে ঘুরে বাড়িটি দেখছিলাম। যদিও দেখার তেমন কিছুই নাই, তবু দেখছিলাম, আর আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ছিলাম।
বিকেলে ফেরার পথ ধরলাম। উনারা থেকে যাওয়ার জন্য অনেক জোরাজুরি করেছিলেন, কিন্তু থাকাটা সম্ভব ছিল না। আসার সময় ব্যাগ-ভর্তি আখরোট দিলেন। নিজেদের বাগানের আখরোট। আমরা খুশি মনে সে উপহার গ্রহণ করলাম। গাড়ি কিছুদূর চলার পর শুরু হলো স্নো-ফল। পৃথিবীতে স্বর্গীয় যে কয়টি দৃশ্য আছে তার মাঝে এটা একটা, স্নো-ফল। চারদিক ঢেকে যায় শুভ্র তুষারে। এ দৃশ্য অতুলনীয়!
কিন্তু তুষার পাতের সময়ে এই অঞ্চলটা বেশ বিপদজনক হয়ে পড়ে। কদিন পরপরই এখানে তুষার-ধ্বসের ঘটনা ঘটে। এতে অনেক প্রাণহানিও ঘটে। কয়েকদিন আগেই পাঁচ ফৌজির মৃত্যু হয়েছিল তুষার ধ্বসে। আরও বড় বিপদ হলো, রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। তেমন কিছু ঘটার আগে আগেই আমরা মেইন রাস্তায় এসে উপস্থিত হলাম। স্নো-ফলের ভেতর দিয়েই ধীরে ধীরে গাড়ি সামনে চলছে। মাঝে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে কিছুসময় স্নো গেইমসও খেলা হলো, মানে স্নো-বল বানিয়ে যে যার দিকে ইচ্ছা ছুঁড়ে মারে!
আমার লুলাব সফর শেষ আপাতত। আবার কোনোদিন সুযোগ হলে, হয়তো আরও কোনো একদিন এমনই বিচিত্র লীলাময় জীবনের স্বাদ চেখে দেখব। তৃপ্ত, কৃতজ্ঞ হয়ে বলবো, আল্লাহ, আপনি আমার কল্পনারও অতীত অনেক দয়া দেখিয়েছেন আমার উপর!

জানুয়ারি, ২০১৮



কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর নির্মম ধর্ষণ-যজ্ঞের দাস্তান

মুনশী নাঈম

১৯৮৭ সালে জম্মু-কাশ্মীরের নির্বাচনে ভোট কারচুপির কারণে রাজ্য বিধানসভার কয়েকটি আসন হারায় উপত্যকার ইসলামি দলগুলো। ঠিক তখন থেকেই ভারতীয় হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে কাশ্মীরিরা। পৃথিবীতে সামরিক অঞ্চল যতগুলো আছে, তার মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকা সবার শীর্ষে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে, এই উপত্যকায় ছয় লাখ ভারতীয় সেনার উপস্থিতি আছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যখন সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলল কাশ্মীরি তরুণরা, তখন থকেই ধর্ষণকে ভারতীয় সেনারা প্রতিরোধ দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। এই উপত্যকার হতভাগ্য অসংখ্য মুসলিম নারীকে কেবল ভারতীয় সেনারাই ধর্ষণ করেনি, বরং ডোগরা সেনা, হিন্দু ও শিখরাও ধর্ষণ করেছে। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে যখন জম্মুতে গণহত্যা চালায় হিন্দু উগ্রপন্থীরা, তখন ডোগরা সৈন্যদের সহায়তায় শিখ ও হিন্দুরা মুসলিম নারীদের অপহরণ ও ধর্ষণ করে। গণধর্ষণের ঘটনাও কম ঘটেনি এই উপত্যকায়।

ধর্ষণ যখন অস্ত্র

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ)-এর ১৯৯৩ সালের এক রিপোর্ট অনুসারে, কাশ্মীরি নাগরিকদের বিদ্রোহের প্রতিশোধ হিসেবে ধর্ষণকে বেছে নেয় ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী। বেশিরভাগ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে তল্লাশির সময়।

এইচআরডাব্লিউ-এর ১৯৯৬ রিপোর্টেও অনুরূপ তথ্য উঠে এসেছে।

পণ্ডিত ইঙ্গার সখজেলসবেইক বলেছেন, সৈন্যরা যখন বেসামরিক বাড়িতে প্রবেশ করে, তখন মহিলাদের ধর্ষণ করার আগে বাড়ির পুরুষদের হত্যা বা গ্রেপ্তার করে। পণ্ডিত শুভ মাথুর ধর্ষণকে কাশ্মীরে ভারতীয় সামরিক কৌশলের অপরিহার্য উপাদান বলে অভিহিত করেছেন। পণ্ডিত সীমা কাজির মতে, কাশ্মীরি পুরুষদের দমানোর হাতিয়ার হিসেবে ভারতীয় সেনারা মহিলাদের ধর্ষণ করে এবং কাশ্মীরি জনগণের প্রতিরোধের মনোবল ভেঙে দিতেই তারা ধর্ষণকে বেছে নিয়েছে।

মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ৫২তম অধিবেশনে অধ্যাপক উইলিয়াম বাক বলেছিলেন, কাশ্মীরি জনগোষ্ঠীকে অপমান ও ভয় দেখানোর জন্য ভারতীয় বাহিনী ধর্ষণকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কাশ্মীরি বিদ্রোহের পাল্টা জবাব দিতে ভারতীয় বাহিনী ধর্ষণকে ব্যবহার করছে। সংস্থাটি কয়েকজন ভারতীয় সৈন্যকে ধর্ষণের কারণ জিজ্ঞেস

করেছিল। কেউ উত্তর দিয়েছে, কাশ্মীরি মেয়েরা সুন্দর, তাই ধর্ষণ করেছে। কেউ উত্তর দিয়েছে, প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ধর্ষণ করেছে। কী জঘন্যতম এবং পৈশাচিক স্বীকারোক্তি!

ধর্ষণের ব্যপ্তি কতটুকু

মেডিসিনস সানস ফ্রন্টিয়ারসের করা ২০০৫ সালের একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, কাশ্মীরি নারীদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতার হার বিশ্বের সংঘাতময় অঞ্চলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, চেচনিয়া, সিয়েরা লোন এবং শ্রীলঙ্কার মতো সংঘাতের শিকার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কাশ্মীরে ধর্ষণের সাক্ষীর সংখ্যা অনেক বেশি। সমীক্ষায় উত্তরদাতাদের ১৩ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা ১৯৮৯ সালের পর ধর্ষণের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। ৬৩ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা ১৯৮৯ সালের পর ধর্ষণের ঘটনা শুনেছেন। ৫৯ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা পাঁচ জনেরও বেশি ধর্ষণের ঘটনা শুনেছেন। ৫.১ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে পাঁচ জনেরও বেশি ধর্ষণের ঘটনার সাক্ষী।
এইচআরডাব্লিউয়ের রিপোর্ট অনুসারে, কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর ধর্ষণের ঘটনার কোনো হিসাব নেই। ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হলেও এর বিচার হয় ন। আবার লজ্জায় অনেকে বলতেই চায় না ধর্ষণের ঘটনা।
মানবাধিকার সংস্থাগুলোর রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ১৯৯২ সালে ভারতীয় বাহিনী ৮৮২ কাশ্মীরি নারীকে গণধর্ষণ করেছে। এদের মধ্যে ধর্ষণ ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে ভারতীয় বাহিনীর দেড়শ'রও বেশি শীর্ষ কর্মকর্তা।
২০১৬ সালে কাশ্মীরি মানবাধিকার কর্মী এবং আইনজীবী পারভেজ ইমরোজ বলেছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক ধর্ষণের এই ভয়াবহ চিত্র এখনো অপরিবর্তিত আছে।

ধর্ষণের পরবর্তী প্রভাব

ধর্ষণের পর ভিকটিম নারীরা সাধারণত শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণায় ভোগেন; কারণ যেহেতু সমাজ বিশ্বাস করে–ধর্ষিত হয়ে সে তার সম্মান হারিয়েছে। ইউনিভার্সিটি অব টেক্সস অস্টিনের সাগর গবেষণা জার্নালের হাফসা কানজওয়ালের মতে, কাশ্মীরি সমাজ যেহেতু ধর্ষণের দোষ চাপায় মহিলাদের উপর, তাই তারা মনে করে তারা সম্মান হারিয়েছে। পবিত্রতা খুইয়ে ফেলেছে। এই বিশ্বাস অনেক সময় হতাশা ডেকে আনে। এমনকি বিবাহবিচ্ছেদ পর্যন্তও গড়ায়। সাক্ষাৎকারে অনেক নারী বলেছেন, ধর্ষিত হবার পর তাদের স্বামী তাদেরকে অপবিত্র মনে করছে। অনেকের বিবাহ ভেঙেছে। অনেকে পরিবার থেকে বহিষ্কৃতও হয়েছে।

ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক ধর্ষণের দলিল

১৯৯০ সালের ২৬ জুন বিএসএফ সদস্যরা জামির কাদিমের একটি এলাকায় তল্লাশি চালানোর সময় ২৪ বছর বয়সী এক তরুণীকে গণধর্ষণ করে। সে-বছর জুলাইয়ে সোপোরের পুলিশ থানায় বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয় [Kazi, Seema. Rape, Impunity and Justice in Kashmir]
১৯৯০ সালের ৭ মার্চ সিআরপিএফ শ্রীনগরের ছানপোরা এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে হানা দেয়। এ সময় বেশ কয়েকজন মহিলা ধর্ষণের শিকার হন। ১৯৯০ সালের ১২ থেকে ১৬ মার্চ 'কমিটি ফর ইনিশিয়েটিভ ইন কাশ্মীর'-এর সদস্যরা কাশ্মীর সফর করেন এবং ধর্ষিতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ধর্ষিতাদের মধ্যে ২৪ বছর বয়সী এক তরুণী তাঁর বিবরণে জানান যে, তিনি ও তাঁর ননদকে তাঁদের রান্নাঘর থেকে সিআরপিএফের ২০ জন সদস্য টেনে-হিঁচড়ে বের করে এবং তারপর তাঁদেরকে গণধর্ষণ করে। তাঁরা অন্য দুজন কিশোরীকে ধর্ষিত হতে দেখেছেন বলেও বর্ণনা করেন। [CHAPTER-V PROBLEM OF HUMAN RIGHTS IN JAMMU AND KASHMIR (PDF)। পৃষ্ঠা ২২৪।]
১৯৯১ সালে শ্রীনগরের বাবর শাহ এলাকায় ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষীরা একজন মানসিক বিকারগ্রস্ত বৃদ্ধা মহিলাকে ধর্ষণ করে। [Bhat, Aashaq Hussain, and R. Moorthy. ÒImpact of Security Provisions in Kashmir. (2016).]
১৯৯১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দল কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার কুনান পোশপোরা গ্রামে একটি তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ অভিযান পরিচালনা করে। এসময় তারা গ্রামটির বিভিন্ন বয়সের শতাধিক নারীকে গণধর্ষণ করে।

১৯৯১ সালের ২০ আগস্ট ভারতীয় সৈন্যরা কুনান পোস্পোরা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরের পাজিপোরা-বাল্লিপোরা গ্রামের ১৫ জনেরও বেশি নারীকে গণধর্ষণ করে। [Mathur, Shubh (১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)। The Human Toll of the Kashmir Conflict: Grief and Courage in a South Asian Borderland| Palgrave Macmillan US| পৃষ্ঠা ৬০]

১৯৯২ সালের ১০ অক্টোবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ২২তম গ্রেনেডিয়ার্সের একদল সৈন্য কাশ্মীরের চক সাইদপোরা গ্রামে প্রবেশ করে এবং ৯ জন নারীকে গণধর্ষণ করে। ধর্ষিতাদের মধ্যে ছিলেন ৬০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা এবং ১১ বছর বয়সী এক বালিকা। [Rape in Kashmir: A Crime of War" (PDF). Asia Watch & Physicians for Human Rights A Division of Human Rights Watch.]

১৯৯২ সালের ২০ জুলাই কাশ্মীরের হারান এলাকায় একটি সেনা অভিযানের সময় বেশ কয়েকজন নারী ধর্ষিত হন। এশিয়া ওয়াচ এবং পিএইচআর কয়েকজন ধর্ষিতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। ধর্ষিতাদের একজনকে দুইজন সৈন্য পালাক্রমে ধর্ষণ করেছিল। আরেকজন ধর্ষিতাকে একজন শিখ সৈন্য ধর্ষণ করেছিল। [Rape in Kashmir: A Crime of War (PDF). Asia Watch & Physicians for Human Rights A Division of Human Rights Watch.]

১৯৯২ সালের ১ অক্টোবর বিএসএফ সদস্যরা কাশ্মীরের বাখিকার গ্রামে ১০ জন লোককে হত্যা করে এবং এরপর নিকটবর্তী গুরিহাখার গ্রামে প্রবেশ করে কয়েকজন নারীকে ধর্ষণ করে। এশিয়া ওয়াচ গ্রামটির একজন নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে, যিনি তাঁর মেয়েকে অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে ধর্ষিতা বলে দাবি করেন (প্রকৃতপক্ষে ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন তাঁর মেয়ে)। ["Rape in Kashmir: A Crime of War" (PDF). Asia Watch & Physicians for Human Rights A Division of Human Rights Watch]|

১৯৯৩ সালে ভারতীয় সৈন্যরা কাশ্মীরের বিজবেহারা শহরের বহুসংখ্যক নারীকে গণধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন করে। স্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তিরা ঘটনাটি প্রচার হলে ধর্ষিতাদের পরিবার অসম্মানিত হবে এই আশঙ্কায় এই ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর ওপর স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের হামলার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সৈন্যরা বিজবেহারা শহরের প্রান্তে গাধাঙ্গিপোরায় একজন নারীকে ধর্ষণ করে। [The Massacre Of A Town By Murtaza Shibli| www.countercurrents.org]

১৯৯৪ সালের ১৭ জুন মেজর রমেশ ও রাজ কুমারসহ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের সৈন্যরা কাশ্মীরের হিহামা গ্রামের ৭ জন নারীকে ধর্ষণ করে। [Hashmi, Syed Junaid (৩১ মার্চ ২০০৭)| Conflict Rape Victims: Abandoned And Forgotten]

১৯৯৪ সালে কাশ্মীরের শেখপোরায় সৈন্যরা একটি বাড়িতে প্রবেশ করে বাড়ির পুরুষদের বন্দী করে ৬০ বছর বয়সী এক নারীকে ধর্ষণ করে। [Bhat, Aashaq Hussain, and R. Moorthy. Impact of Security Provisions in Kashmir. (2016)]।

১৯৯৪ সালে ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সদস্যরা কাশ্মীরের থেনো বুদাপাথারিতে এক মহিলা ও তাঁর ১২ বছর বয়সী মেয়েকে ধর্ষণ করে। [Bhat, Aashaq Hussain, and R. Moorthy. Impact of Security Provisions in Kashmir. (2016)]।

১৯৯৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের সৈন্যরা কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার বুরবুন গ্রামের একটি বাড়িতে প্রবেশ করে তিনজন নারীকে যৌন নির্যাতন করে এবং ধর্ষণের চেষ্টা করে। ["India's Secret Army in Kashmir"| Human Rights Watch]|

১৯৯৭ সালের নভেম্বরে কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার নরবল পিঙ্গালগোমে ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষীরা একজন তরুণীকে ধর্ষণ করে। [Bhat, Aashaq Hussain, and R. Moorthy. ÒImpact of Security Provisions in Kashmir. (2016).]।

১৯৯৭ সালের ১৩ এপ্রিল ভারতীয় সৈন্যরা শ্রীনগরের নিকটে ১২ জন কাশ্মীরি তরুণীকে জোরপূর্বক নগ্ন করে এবং গণধর্ষণ করে। [Van Praagh, David (2003)| Greater Game: Indias Race with Destiny and China|

McGill-Queens University Press| পৃষ্ঠা ৩৯০]
১৯৯৭ সালের ২২ এপ্রিল ভারতীয় সৈন্যরা কাশ্মীরের বাভুসা গ্রামে ৩২ বছর বয়সী এক নারীর বাড়িতে প্রবেশ করে ঐ নারীর ১২ বছর বয়সী মেয়ের ওপর যৌন নির্যাতন করে এবং ১৪, ১৬ ও ১৮ বছর বয়সী বাকি তিন মেয়েকে ধর্ষণ করে। অন্য একটি বাড়িতে তারা আরো কয়েকটি মেয়েকে ধর্ষণ করে এবং মেয়েটির মা বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে মারধর করে। [ÒIndia: High Time to Put an End to Impunity in Jammu and KashmirÓ (PDF). 15 May 1997. Archived from the original (PDF) on 29 October 2013]
কাশ্মীরের দোদা জেলার লুদনা গ্রামের ৫০ বছর বয়সী এক নারী হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে জানান, ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের সদস্যরা তাঁর বাড়ি থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় এবং প্রহার করে। এরপর একজন হিন্দু ক্যাপ্টেন তাঁকে ধর্ষণ করে এবং বলে যে, 'তোমরা মুসলিম, এবং তোমাদের সকলের সাথে এমন আচরণ করা হবে।' [Under Siege: Doda and the Border Districts| Human Rights Watch]
২০০০ সালের ২৯ অক্টোবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৫ বিহার রেজিমেন্টের সৈন্যরা কাশ্মীরের বিহোটায় একটি তল্লাশি অভিযানের সময় একজন নারীকে তুলে নিয়ে আসে। পরবর্তী দিন ২০ জন নারী ও কয়েকজন পুরুষ ঐ মহিলাকে মুক্ত করার জন্য যান। কিন্তু সৈন্যরা আগত মহিলাদের ৪-৫ ঘণ্টার জন্য বন্দী করে রাখে এবং তাদের ওপর অত্যাচার করে। [Kazi, Seema. ÒRape, Impunity and Justice in Kashmir ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ১৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে.]
২০০৪ সালের ২৮ অক্টোবর কাশ্মীরের জিরো ব্রিজের একটি গেস্ট হাউজে চারজন নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সদস্য ২১ বছর বয়সী এক তরুণীকে গণধর্ষণ করে। [Bhat, Aashaq Hussain, and R. Moorthy. ÒImpact of Security Provisions in Kashmir. (2016)]
২০০৬ সালের ৬ নভেম্বর কাশ্মীরের বাদেরপাইনে এক মা এবং তাঁর মেয়ে ধর্ষিত হন। ধর্ষণকারী সেনা কর্মকর্তা (মেজর রহমান হুসেইন) একজন মুসলিম হওয়ায় সেনা কর্তৃপক্ষ এটিকে কোনো ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করে নি। পরবর্তীতে ঐ কর্মকর্তাকে ধর্ষণের বদলে বেসামরিক সম্পত্তির অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে শাস্তি দেয়া হয়। [Ashraf, Ajaz| Do you need 700,000 soldiers to fight 150 militants? : Kashmiri rights activist Khurram Parvez| Scroll.in (ইংরেজি ভাষায়)]
২০০৯ সালের ২৯ মে কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় ভারতীয় সৈন্যরা আসিয়া এবং নিলুফার জান নামে দু'জন নারীকে অপহরণ ও গণধর্ষণের পর হত্যা করে।
ভারতীয় সেনাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা
পণ্ডিত সীমা কাজীর মতে, কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে সবচেয়ে কম তদন্ত ও মামলা হচ্ছে ধর্ষণ মামলায়। নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯১ সালের কুনান পোশপোরায় গণধর্ষণের ঘটনার পর ভারত বিবৃতি দিয়ে বলেছিল, কোনো যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেনি।
এইচআরডাব্লিউ ১৯৯৩ সালের প্রতিবেদনে বলেছিল, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনী কর্তৃক ব্যাপক যৌন সহিংসতার ঘটনা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ ধর্ষকদের কোনো বিচার করেনি। সংস্থাটি ১৯৯৬ সালের রিপোর্টে বলেছে, বিচার তো দূরের কথা, ঘটনার তদন্তই করে না কর্তৃপক্ষ।
সীমা কাজীর মতে, রাষ্ট্রীয় অনুমোদন পেয়েই ভারতীয় সেনারা ধর্ষণের মতো পাশবিক কাজে লিপ্ত হয়। মাথুরের মতে, ভারত সরকার ধর্ষকদের আইনি প্রোটেকশন দেয়।
সুখেলসবেইকের মতে, বিচারহীনতাই কাশ্মীরে যৌন সহিংসতার অনুমতি দেয়।
পণ্ডিত ওম প্রকাশ দ্বিবেদী এবং ভিজি জুলি রাজনের মতে, সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন (এএফএসপিএ) ভারতীয় সেনাদের যুদ্ধাপরাধ করতে উৎসাহিত করে। এই ক্ষমতার বলে তারা যেকোনো বেসামরিক বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারে। তাদের এই স্বাচ্ছাচারিতার সুযোগ দেয়ার কারণে কাশ্মীরের বিচার বিভাগও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না।



‘হায়দার’ মুভির চকোলেট বয় কিংবা একজন কাশ্মীরি শহিদ

রাকিব নাঈম

২০১৩ সালের ডিসেম্বর। কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী এবং ভারতীয় সেনাদের মাঝে একটি লড়াইয়ের উপর ভিত্তি কওে বলিউডের চলচ্চিত্র নির্মাতা বিশাল ভরদ্বজ নির্মাণ করছেন ‘হায়দার’ নামের একটি মুভি। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন টাবু এবং শহিদ কাপুর। ১৫ সেকেন্ডের একটি দৃশ্যের জন্য একটি চকোলেট বয় খুঁজছিলেন নির্মাতা।

আইজাজ তার ভাগ্নে, ষষ্ঠ শ্রেণি পড়ুয়া, ১৩ বছরের সাকিবকে নিয়ে উপস্থিত হলেন সেন্টার লেক ভিউ হোটেলে। প্রথম দেখায় পরিচালকের চোখ শীতল। দুটো শটের এগ্রিমেন্ট সাইন করে সাকিবের হাতে পরিচালক তুলে দিলেন ১৪০০ রুপি।

অমর সিং কলেজে পরিচালক বিশাল ভরদ্বজের ক্যামেরার সামনে এই প্রথম দাঁড়ায় সাকিব। দৃশ্যটি হলো–অমরসিং কলেজে অনেক শিশু, তার মাঝে সাকিবও আছে। হঠাৎ বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। অনেক শিশু মারা যায়। কিন্তু সাকিব চোখে ভয় এবং কাতরতা নিয়ে একাকী বেঁচে যায়। ১৫ সেকেন্ডের সংক্ষিপ্ত একটি শট দিয়ে সাকিবের জীবনে শুরু হয় এক নতুন জীবনের যাত্রা।

হায়দার মুভির সংক্ষিপ্ত এ উভয় শটের জন্যই সাকিব দর্শক-নন্দিত হয়। কাশ্মীরের বান্দিপোরার হাজিন এলাকার ছেলে সাকিব। বলিউড ব্লকবাস্টার ‘হায়দার’ মুভিতে ক্যামেরার সামনে প্রথম দাঁড়ালেও অভিনয়ে যুক্ত ছিলেন আরও আগে থেকেই। স্থানীয় থিয়েটারের অনেক নাটকেই অংশ নিয়েছিলেন। স্কুলে পড়ার সময় তাঁর প্রথম মঞ্চে অভিনয় ‘এই পথ’ নামের একটি শিশু নাটকে। নাটকটি শ্রীনগর ও ওড়িশায় প্রদর্শিত হয়েছিল।

ফোক সং তথা লোকগানের প্রতি আলাদা একটা দুর্বলতা ছিল সাকিবের।

হাজিন এলাকায় কারও বিয়ে হলেই গীত গাওয়ার জন্য ডাক পড়ত তাঁর। সাকিবের মামা আইজাজ স্মৃতিচারণ করে বলেন, ‘২০১৬-এর নাজুক সময়। বুরহান ওয়ানির শাহাদাতের প্রতিবাদে উত্তাল কাশ্মীর। তখন আমার বিয়েতে বেশ কয়েকটি লোকসংগীত গেয়েছিল সাকিব। শুধু সংগীত নয়, খাবারের প্রতিও আসক্তি ছিল তার। প্রতিদিন ছয়টি করে ডিম খেতো।’

২০১৭ সালে এসএসসি পাশ করে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট সাকিব। সুম্বল নিউ গ্রিনল্যান্ড কলেজের একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়। তার বাবা, হাজিন পৌরসভার কর্মচারী, বেলাল আহমদ শেখ বলেন, ‘সাকিব ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইতো। সারাক্ষণ ফিজিঙ, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ নিয়ে পড়ে থাকতো। ফুটবল খেলা তার প্রিয় ছিল।’

টার্নিং পয়েন্ট

একাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময় অন্য এলাকার এক ছেলের সাথে গভীর বন্ধুত্ব হয় সাকিবের। ছেলেটির নাম মুদাসির। হাজিন থেকে তিন এলাকা দূরে বসবাস করলেও, মুদাসির পড়ত বান্দিপোড়া জেলার হাজিনের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে, নবম শ্রেণিতে। ফুটবল খেলার মাঠে দেখা হয় তাদের, বাড়ে বন্ধুত্ব, জমে ঘনিষ্ঠতা। কাছে আসে একে অপরের।

সাকিবের পরিবারে টানাপোড়েন ছিল না। মুদাসির ছিল তার উল্টো। পরিবারের টানাপোড়েন দূর করতে তাকে কাজ করতে হতো। তারপর স্কুল। মুদাসিরও ফুটবল-প্রেমী, নিজের অর্জিত টাকায় কিনেছিল ফুটবল। তার বাড়িতে ছিল অসুস্থ মা-বাবা, প্রতিবন্ধী ভাই এবং ১০ বছরের একটি বোন।

২০১৬ সালে ভারতীয় সৈন্যের ওপর পাথর নিক্ষেপের মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিল মুদাসির। তার বাবা রাশিদ এক সপ্তাহ দৌড়াদৌড়ি করে জামিন মঞ্জুর করিয়েছিলেন। পুলিশ তখন বলে দিয়েছিল, ‘ভাবগতি ভালো না ছেলের। দেখে রাখবেন।’

মুদাসিরের সবচেয়ে আপন বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিল ১৯ বছরের তরুণ আবিদ হামিদ মীর। মুদাসির একটা অন্যরকম অনুরাগ পোষণ করত তার প্রতি। হাজিন থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে সোপেরের অমরগড়ে ভারতীয় সৈন্যের অ্যানকাউন্টারে শহিদ হয় হামিদ মীর। ঘটনাটা মানতে পারে না মুদাসির। মারাত্মক আঘাত লাগে তার আবেগে, বিশ্বাসে, চিন্তায়, চেতনায়। আচ্ছা, আমাদের ভূমিতে আমরাই কেন বারবার মার খাই? আমরাই কেন অ্যানকাউন্টারে মরি? হামিদ মীরকে হারিয়ে বড় একা হয়ে পড়ে মুদাসির। স্কুলে যায় মলিন মুখে, খেলার মাঠে অনুজ্জ্বল। ঠিক এই সময় পাশে দাঁড়ায় সাকিব। হাতে হাত রেখে ব্যক্ত করে একসঙ্গে এগিয়ে যাবার প্রত্যয়। বয়স এবং ক্লাসের তফাৎ সত্ত্বেও একে অপরের বন্ধু হয়ে ওঠে।

নিখোঁজ সংবাদ

২০১৮-এর ৩১ আগস্ট। দুপুরবেলা সাকিবের মা তাকে দোকানে পাঠালেন কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে। রোদ মাথায় সাকিব বেরিয়ে যায়, কিন্তু ফেরার কোনো নাম-গন্ধ নেই। ঘরে ফেরে না সে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। রব পড়ে যায় পরিবারে–সাকিব নিখোঁজ। সঙ্গে নিখোঁজ সাকিবের সবচেয়ে কাছের বন্ধু মুদাসির। কারও কোনো খবর নেই। থানায় জিডি হলো।

সাকিবের মা পুলিশকে কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, ‘ছেলেটার কোনো শখ অপূর্ণ রাখিনি, সব পূর্ণ করেছি। তবুও কেন ও চলে গেল? পুলিশ সাহেব, একবার ছেলেটাকে খুঁজে এনে দিন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো, কিসের অভাব ছিল তার?’

পুলিশ জানতে চায়, ঘরে স্বাধীনতা, পুলিশের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হতো কিনা। সাকিবের বাবা স্পষ্ট জানান, ‘এসব নিয়ে কখনো কথা হতো না পরিবারে।’

সবার একটাই প্রশ্ন–কোথায় গেল ছেলেটা! কী জন্য গেল?

পুলিশ খুঁজে পেলে তাদের জানাবে বলে আশ্বস্ত করে।

শহিদ সাকিব

নিখোঁজ হয়ে যাবার পর নিজ গ্রাম হাজিনে কয়েকবারই এসেছিল সাকিব। কিন্তু পরিবারের কারও সঙ্গে দেখা করেনি। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেছে, আবার চলে গেছে। বন্ধুরাও বিষয়টি কাউকে জানায়নি।

৯ ডিসেম্বর, ২০১৮। শ্রীনগরের উপকণ্ঠে মুজগন্ড এলাকায় ভারতীয় হানাদার বাহিনী এবং কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীদের মাঝে সংঘর্ষ শুরু হয়। টানা ১৮ ঘণ্টা চলে দমবন্ধ বন্দুকযুদ্ধ। এতে শাহাদত বরণ করেন তিনজন স্বাধীনতাকামী, আহত হয় হানাদার বাহিনীর এক জওয়ান এবং তিন বেসামরিক নাগরিক। শাহাদাতবরণকারীদের পুলিশ চিহ্নিত করে–সাকিব, মুদাসির এবং আলী!

চকোলেট বয় কেন বেছে নিলো লড়াইয়ের ময়দান?

বলিউড ব্লকবাস্টার ‘হায়দার’ মুভিতে সাকিব বেঁচে গেলেও, কাশ্মীরের ময়দানে বাঁচতে পারেনি। কিন্তু কথা হলো ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইতো যে ছেলেটা, অভিনয়ে ছিল যার মারাত্মক নেশা, হঠাৎ কী হলো তার–ছুটে এলো রণাঙ্গনে? এই কৈশোরে তুলে নিলো রাইফেল?

মুদাসিরের পরম আত্মীয় হামিদ মীর ভারতীয় হানাদার বাহিনীর অ্যানকাউন্টারে নিহত হয়েছিলেন ২০১৭ সালে। বিষয়টি মুদাসিরের মনে জন্ম দিয়েছিল ক্ষোভের। তার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল তখন–আমরাই কেন বারবার অ্যানকাউন্টারের শিকার হই?

মুদাসিরের পরিবারের বয়ান

হলো–’মানসিকভাবে খুব একাত্ম ছিল সে হামিদ মীরের সাথে। তার মৃত্যুটা সে মেনে নিতে পারেনি। তার কাছে মনে হয়েছে এটা অন্যায়। এই চিন্তাটাই মুদাসিরকে অস্ত্র তুলে স্বাধীনতার শ্লোগান দিতে বাধ্য করেছে।’ হামিদ মীরকে হারিয়ে একা হয়ে পড়ে মুদাসির। তার এই একাকিত্ব পূর্ণ করে দেয় সাকিব। মুদাসির-ই সাকিবকে প্রভাবিত করে। তার চিন্তা মোড় নেয় অভিনয় থেকে স্বাধীনতার স্বপ্নে। সাকিবও হাতে তুলে নেয় রাইফেল।

এটিই প্রথমবার নয়, যখন কাশ্মীরি কিশোরেরা রাইফেল হাতে তুলে নিয়েছিলো। ২০১০ সালে কাশ্মীরে প্রতিবাদের এক নতুন জোয়ার এনেছিলেন বুরহান ওয়ানি। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। ২০১৪ সালে স্বাধীনতার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল ১৪ বছরের শেখ দাউদ। তার পরিবারের বয়ান–ভারতীয় সেনাদের চূড়ান্ত নির্যাতনই তাকে রাইফেল হাতে নিতে বাধ্য করেছিল। ২০১৬ সালে শেখ দাউদ শহিদ হন। ২০১৭ সালের ২৭ মে, শহিদ হন কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী ১৫ বছর বয়সী ফয়জান আহমদ। তাঁর পরিবারও রাইফেল হাতে তুলে নেয়ার জন্য ভারতীয় সেনাদের নৃশংসতাকে দায়ী করেছে।

চকোলেট বয়ের জানাজা

হাজিনের ঈদগাহ প্রাঙ্গণে কাশ্মীরি মহিলা ও শিশুসহ হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছেন। তাঁরা হাজির হয়েছেন তাঁদের স্বাধীনতার দাবিতে প্রাণ দেয়া সাকিবের জানাজায় অংশ নিতে। সবার চোখে জল। একজন শহিদের জানাজায় অংশ নেয়ার চেয়ে বড় পূণ্য তাঁদের কাছে আর কিছু নেই। সাকিবের বাবার মন স্মৃতিকাতর হয়। এই মাঠেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাকিব মুদাসির ফুটবল খেলত। দৌড়াদৌড়ি করত। আজ এখানেই হচ্ছে তাদের জানাজা। এমন কত মায়ের বুক খালি হচ্ছে প্রতিদিন কাশ্মীরের সবুজাভ ভূমিতে? মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন স্বাধীনতা। আমি তো আমার ছেলের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনটাই পুরো করতে পারিনি।

চোখের জল মুছতে মুছতে সাকিবের বাবা বিলাল শেখ তাকবির তোলেন, নিজের ঔরসজাত সন্তানের জানাজার নামাজের তাকবির–আল্লাহু আকবার!

সূত্র : হিন্দুস্তান টাইমস, স্ক্রল ডট ইন, নিউজ এইটিন



(ছোটোগল্প)
শেষ করে দিয়ে সব নীরবতা

আবরার ফাহিম

নিদারুণ বিরক্তির সাথে হাত ঘড়িটার দিকে তাকালো শামীম। চোখজোড়া কুঁচকে গেল তার। আধ ঘন্টা দেরি। সুবিশাল তকতকে লাউঞ্জের বাঁদিকে একটা সোফায় আড়াআড়িভাবে বসে আছে সে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল। বিভিন্ন বয়সী আরও কিছু যাত্রীকে তারই মতো অপেক্ষমান দেখা গেল, কিছু বিদেশিও চোখে পড়ল। সবার মধ্যেই এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করছে। বেঁটে, গোলগাল চেহারার, স্যুট-টাই পরা লোকটার দিকে চোখ আটকে গেল শামীমের। দুহাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে আলস্য ভঙ্গিতে পায়চারী করছেন। ভদ্রলোকের চেহারায় মিটিমিটি একটা হাসি ঝুলছে। মনে হচ্ছে এই অস্থিরতাটাকে উপভোগ করছেন তিনি। সোফার অন্যপাশে শেতাঙ্গ এক বৃদ্ধ কুঁজো হয়ে বসে একটি ইংরেজি ম্যাগাজিনে চোখ বুলাচ্ছেন। মাথার সমস্ত চুল, ভ্রু জোড়া, এমনকি চোখের পাপড়িও সাদা। বার্ধক্যহেতু ঝুলেপড়া চামড়ার মুখটায় তিলের ছড়াছড়ি। বাম পাশে কাত হয়ে থাকা সিলভারের লাঠিটা কৃত্রিম আলোয় ঝলসে উঠছে। শামীম এইসব দেখে সময় পার করার চেষ্টা চালিয়ে গেল।

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বিশাল লাউঞ্জে একদল যাত্রীর উপস্থিতি লক্ষ করা গেল। এদের আজকের যাত্রা বরফ-ঘেরা পাহাড়ের দেশ নেপাল। নেপালকে বলা হয় হিমালয়-কন্যা। এখানেই দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বত শৃঙ্গ 'মাউন্ট এভারেস্ট'। দৈত্যাকৃতির বিশাল দেহটা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়টা যেন আকাশ ছোঁয়া। ইউএস বাংলার একটি বিমান ঠিক দুপুর একটায় এদেরকে নিয়ে উড়ে যাওয়ার কথা। সিডিউল বিপর্যয়ের কবলে পড়ে ফ্লাইটটি প্রায় দেড় ঘণ্টা পিছিয়ে গেল। ফরহাদ প্রবল অস্বস্তির সাথে দাঁত দিয়ে নখ কাটছে। তার মধ্যে এক ধরনের ভয় কাজ করছে। সে অতিশয় ভয় নিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। পাশে রাখা সেলফোনে নাকি সুরে গান বেজে উঠল। আবার মায়ের ফোন। এই নিয়ে অষ্টমবারের মতো তাকে বলতে হলো 'মা, চিন্তা করো না, আমি পৌঁছে তোমাকে কল করব।' ফরহাদ কাঁধ-ব্যাগটা কোলে নিয়ে দুই হাতে শক্তভাবে চেপে রাখল। ছিপছিপে তিনটা ছেলে ফরহাদের পাশে এসে বসে পড়ল। ছেলেগুলো একটু বেশিমাত্রায় উচ্ছল। সেই শুরু থেকে হুল্লোড়ে মাতিয়ে রেখেছে পুরো জায়গাটা। ফরহাদ ভয়ে ভয়ে এদের কর্মকাণ্ড দেখতে লাগল। ফরহাদের ঠিক পেছনে একজোড়া ছেলেমেয়ে গুটিগুটি করে কথা বলছে। কথার ধরনই বলে দিচ্ছে, মেয়েটি নবপরিণীতা। দুই হাত ভরা মেহেদির রং এখনো অমলিন। ছেলেটি কথা বলছে বেশ লাজুক স্বরে। তার ঠিক অদূরেই আরেকটি মেয়েকে সুস্থির চিন্তাহীন হয়ে বসে থাকতে

দেখা গেল। এই মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন জগতের কোনো কিছুই অস্বাভাবিক নয়। মেয়েটিকে দেখে ফরহাদ এক ধরনের মমতা অনুভব করল। এই মমতার রহস্য সে বুঝে উঠতে পারল না। একটা কফি নেয়া যায় কিনা ভাবছে ফরহাদ। তখনই স্পিকারে সুরেলা নারীকণ্ঠ ভেসে আসলো। যাত্রীরা সবাই ব্যস্ত ব্যস্ত ভাবে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

মধ্যাকাশে টুকরো টুকরো মেঘ ভেদ করে ছুটে চলা প্রকাণ্ড উড়োজাহাজটার পেটের ভেতর বসে আছে শামীম। প্রায় গোলাকৃতির জানালা ভেদ করে দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে অতি নিচে বিস্তৃত সবুজের সমারোহে। যেন সবুজ কার্পেটে মোড়ানো পৃথিবী। ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে দিঘির নীল জলরাশি, দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ, উঁচু-নিচু অসংখ্য টিলা। এখান থেকে বিমানের আধোডানা দেখা যাচ্ছে। ঘাড় ঘোরাতেই খানিক চমকে উঠল শামীম। সেই টাকমাথার বেঁটে লোকটা তার পাশে এসে আসন দখল করেছে। চোখে চোখ পরতেই একগাল হেসে লোকটাকে আমন্ত্রণ জানালো শামীম। লোকটার প্রতিক্রিয়া হলো ঠিক উল্টো। তার কপালের মাঝের অংশ হঠাৎ করেই কুঁচকে গেল। নিতান্ত শুষ্ক একটা হাসি দিয়ে সৌজন্যবোধটুকু রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা গেল না লোকটার মাঝে। মারাত্মক অপমানিত বোধ করল শামীম। মনে মনে মোটামুটি অশ্লীল একটা গালি দিয়ে বসলো।

অনেক পরে শামীম বুঝতে পারল, উপরে যেমনই হোক, ভেতরে কিন্তু সে দারুণ আনন্দিত। শামীমের কাছে মনে হলো, লোকটা বিরল কোনো রোগে আক্রান্ত। বেদনার ভঙ্গিমায় সুখ প্রকাশ করা এই রোগের প্রধান লক্ষণ। লাউঞ্জে লোকটার হাতে গাঢ় নীল রঙের বিশাল একটা লাগেজ দেখেছিল শামীম। লোকটার সাথে নীল রং বেশ মানানসই মনে হলো। সামনের সিটে কয়েকটা ছেলে উচ্চস্বরে গান ধরল। গানের কিছু শব্দ বেশ কুরুচিপূর্ণ। ওরা সেই অশালীন শব্দগুলোই আয়েশ করে শোনাতে লাগলো। আশপাশের যাত্রীরা চোখ গরম করে শাসালো, কিন্তু ওরা এই চোখরাঙানি আমলে নিলো বলে মনে হলো না।

বাঁ হাতে মাথার হ্যাটটা সোজা করে নির্দিষ্ট আসনে গা এলিয়ে দিলেন আসলাম শেখ। কাঠমান্ডু অফিসের ফাইলটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন। আড়চোখে লক্ষ্য করলেন, তার পাশে এসে জুটেছে কোঁকড়া চুলের মাঝ বয়সী এক যুবক। সে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। 'ওয়াশরুমটা কোন দিকে?' এটা জানতে চেয়ে একজন ক্রুর সাথে ২০ মিনিট কথা বলল। দুই ধরনের লোক আসলাম শেখ বড়ই অপছন্দ করেন। এক হচ্ছে যার সব কিছুতেই অতি উৎসাহ, আর দ্বিতীয় হলো, যে কারণে অকারণে বেশি কথা বলে। দুর্ভাগ্যের কথা, এই দুইটা অভ্যাসই তিনি তাঁর স্ত্রীর মধ্যে পেয়েছেন। পাশে বসা ছোকরাটার মধ্যেও বোধহয় এই দুই বদ স্বভাব বিদ্যমান।

'আঙ্কেল, এখানে কি ডিনারের কোনো ব্যবস্থা হবে?'

আসলাম শেখ দায়সারা জবাব দিলেন।

'আচ্ছা আপনি কি ট্যুরে যাচ্ছেন নাকি অফিসের কোনো কাজে?'

ছোকরা জবাবের অপেক্ষা না করেই বলতে শুরু করল, 'যদি ট্যুরে যান তাহলে আমাকে কিন্তু সাথে নিতে পারেন। কাঠমান্ডুর প্রতিটি কোনা আমার নখদর্পণে। ললিতপুরের লাল পেস্তা খেয়েছেন কখনো? একেবারে অমৃতের মতো। প্রথম কামড়ে অবশ্য তেতো মনে হবে। আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে আসল স্বাদ।'

ছোকরা কথার পিঠে কথা চালিয়ে যেতে লাগল। আলোচনার বিষয়বস্তু তার বাবা, নানার গল্পে গিয়ে ঠেকলো। আসলাম শেখ প্রথম প্রথম মৃদু মাথা নেড়ে সমর্থন জানালেন। তারপর বিরক্তি প্রকাশক শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন। কিছুতেই কিছু হলো না। ছোকড়ার বস্তা ভরা কথা ফুরোতেই চায় না। এই পর্যায়ে এসে সে তার একমাত্র খালার বাড়ি সুইডেনের গল্প আরম্ভ করল। আসলাম শেখ ফাইল বন্ধ করে চোখ মুদলেন। তার মাথা ধরে গেছে, তিনি কল্পনা করলেন যে, তিনি ছেলেটার ডান গালে কষে একটা থাপ্পড় মেরেছেন। তাঁকে চোখ মুদতে দেখেই ছেলেটা বলে উঠল, 'কী ব্যাপার, আপনার কি মাথা ধরেছে? তাহলে আমার সাথে কথা বলুন। কথা বললে মাথাব্যথা থেমে যাবে।' আসলাম শেখের বিরক্তি সীমা অতিক্রম করে ভয়ানক রাগে পরিণত হলো।

'এক্সকিউজ মি, আমি কি বসতে পারি?'

নিপা চওড়া একটা হাসি দিয়ে বলল, 'সিটটা আপনার হলে অবশ্যই বসুন।' লম্বা স্বাস্থ্যবান লোকটা বেশ সময় নিয়ে নিপার বাঁদিকের আসনটায় বসে পড়ল। যেন বসাটাও কোনো শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। নিপা আলতো করে কানের উপর পড়ে থাকা চুল পিঠের দিকে ছড়িয়ে দিলো। লোকটা বসেই হাত দুটো ঝাড়া দিলো।

সোনালি রঙের হাতঘড়িটা চকচক করে উঠল। নিপা ডান হাতের তালুর উপর চিবুক রাখল। তার সমস্ত দৃষ্টি স্বচ্ছ কাঁচ ভেদ করে সীমাহীন আকাশের দিকে নিবদ্ধ। অজস্র শূন্যতা এসে ভর করল। হঠাৎ করেই নিপার মায়ের কথা মনে পড়ল। মা আজ পৃথিবীতে নেই। কিন্তু নিপা সমস্ত শরীর দিয়ে মায়ের অস্তিত্ব অনুভব করে।
ছেলেবেলায় মায়ের কোলে মাথা না রেখে নিপা ঘুমাতে পারতো না। মা তার একরাশ কালো চুলে বিলি কেটে দিতেন। এখনো সে মায়ের কোলে ঘুমোতে চায়। সমগ্র দেহমন একীভূত করে মায়ের স্পর্শ পেতে চায়। মায়ের মায়ার বাঁধন থেকে সে মুক্ত হতে চায় না কোনোদিন। লাউঞ্জে একটা ভীতু প্রকৃতির ছেলে বারবার তাকে দেখছিল। ছেলেটির চোখে মায়ার সমুদ্র টের পেয়েছিল নিপা। আজন্ম ছুটে চলা এই পৃথিবীতে মায়া জিনিসটা বড়ই অদ্ভুত।
মাইক্রোফোনে গম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে বাজতেই সংবিৎ ফিরে পেল নিপা। গুমোট পরিবেশটাতে সহসা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। সকলকে সিটবেল্ট বাঁধতে বলা হয়েছে। ১০ মিনিটের মাথায় বিমানটি কাঠমাণ্ডু বিমানবন্দরে ল্যান্ড করবে। নিপার কেন যেন একটু ভয় ভয় করতে লাগল। শেষবারের মতো সবার চেহারায় চোখ বুলিয়ে নিলো। সকলের চোখে-মুখে তখন অনাবিল স্নিগ্ধতার আবেশ।
কাঠমাণ্ডু ত্রিভুবন বিমানবন্দরের এয়ার কন্ট্রোল টাওয়ারে দাঁড়িয়ে কফির মগ হাতে রাডারে চোখ রাখছিল ইয়েকো তেরপা। ইউএস-বাংলার বোয়িং ৭৩৭ বিমানটি নাক নিচু করে বিকট আওয়াজে রানওয়ে ছুঁলো। পাখির চোখ দিয়ে বিমানের গতিবিধি লক্ষ করছিল তেরপা। দ্রুত বেগে ধাবিত বিমানটিকে হঠাৎ অস্বাভাবিক মনে হলো। তৎক্ষণাৎ পাইলটের সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলো সে।
'হ্যালো, লিসেন টু মি, এনি প্রবলেম?'
ওপাশ থেকে শোনা গেল ক্যাপ্টেন খালেদা আকরামের অস্ফুট স্বর। ছোট্ট করে জবাব আসলো, 'নো'।
প্রশান্তির নিঃশ্বাস ফেলল তেরপা। ঠিক আগের জায়গাটায় এসে দাঁড়াল। ধোঁয়া ওঠা কফির মগে একটা চুমুক দিলো। এখান থেকে বিমানের লেজ চোখে পড়ছে। একটু পর লক্ষ করলো তেরপা, বিমানটি রানওয়ে থেকে বেরিয়ে এসে সোজা মাঠের দিকে ছুটছে। ভেতরটা ধক করে উঠল তার। শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে গেল। পাথরের মতো জমে গেল সে। ভয়ের চোটে ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখদুটো দিয়ে সে দেখল, অনবরত আছাড় খেতে খেতে মাঠের ভেতর দিয়ে এগুচ্ছে বিমানটি। মাঠের ঠিক মাঝে এসে শিকার করা জন্তুর মতো মুখ থুবড়ে পড়ল। বাম বাহুতে আগুন ধরে গেল। বিমানের ভেতর থেকে অসংখ্য ভীতিকর চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে বিমানের পুরো অংশে আগুন ছড়িয়ে পড়ল।
আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ভয়ানক বিস্ফোরণ হলো। বিমানবন্দরের সুউচ্চ প্রাচীরগুলো আর্তনাদ করে উঠল। গোধূলিলগ্নে নীড়ে ফেরা পাখিরা সশব্দে ডানা ঝাপটালো। সন্ধ্যালোকের নির্জনতা ভেঙে দিয়ে আহতদের আর্তচিৎকার বাতাসকে ভারি করে তুলল। এই বাতাসে সত্যিই লাশের গন্ধ ভাসছে। এই আকাশ, এই মাটি, এই ধুলোবালি, প্রলয়ংকর ভয়াবহতা থেকে নিষ্কৃতি চাইছে। এই ধ্বংসলীলা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। এই বিভীষিকাময় দৃশ্য হৃদয়ের গভীরে তীব্রভাবে কষাঘাত করে।
মানুষ মাত্রই স্বপ্নচারী। স্বপ্ন দেখেই সে জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে। মানুষ তাই প্রতিনিয়ত ছুটে চলে স্বপ্নের পেছনে। অবিরত, অবিশ্রান্ত। ছোট্ট এই উড়োজাহাজটির যাত্রীরাও ছুটে চলেছিল স্বপ্নের পথ ধরে। কিন্তু এই পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল এক মহাসত্য। এই মহাসত্য অস্বীকার করার উপায় কারও নেই।
ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বিমানটির এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ব্যবহৃত বস্তু। যেগুলোতে এক সময়ে মায়ের স্পর্শ ছিল। ছিল মমতার কোমল ছায়া। এখন এগুলো পুরে কয়লা হয়ে গেছে। এগুলোর ভেতর পাওয়া গেল একটা লাঠি। আর ছিল একটি বড় লাগেজ। এই লাগেজের রং কি নীল?
পরদিন নিহতদের স্বজনরা আসলো লাশ শনাক্ত করতে। এরা আজ পৃথিবীর সবচেয়ে হতাশাগ্রস্ত মানুষ। শোকের প্রতাপে এদের কান্নারাও থমকে গেছে। এক বাবা তার মেয়েকে খুঁজছিলেন। মেয়েটির নতুন বিয়ে হয়েছিল। পুড়ে যাওয়া অসংখ্য লাশের ভিড়ে মেয়ের মরদেহ চিহ্নিত করার উপায় ছিল না। অবশেষে আঙুলে বিয়ের আংটি দেখে মেয়েকে শনাক্ত করলেন বাবা। আহা, কী কষ্ট, কী নিদারুণ শোকের যন্ত্রণা!
(২০১৮ সালের ১২ মার্চ কাঠমাণ্ডু ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভয়াল বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।)
লালবাগ, ঢাকা



কৈশোরে বাড়ি ছেড়ে পালানোর গল্প

জামিল আহমাদ আকন্দ

তখন আমার বয়স সাত কি আট হবে। আম্মু একদিন কী কারণে যেন শাসন করেছিলেন, রাগে অভিমানে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যাই বাড়ি থেকে। কী জেদটা না ছিল তখন, নিয়ত করে ফেলেছি আর বাড়ি ফিরব না। পকেটে মাত্র সামান্য কয়েকটা টাকা। চলে যাই স্টেশনে। কীভাবে যেন পেয়ে যাই আরেকটা সঙ্গী। সাঈদ। ওর কথায় ট্রেনে উঠে পড়ি। ভয়ে গায়ের রক্ত হিম যায়। নামতে চাইলেও আর পারি না। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ট্রেনের গতির আর শব্দের সাথে মনের ধুকধুকানিও বেড়ে চলছে সমান তালে। কাঁদো কাঁদো অবস্থা। চলতে চলতে ট্রেন এসে থামল টঙ্গী স্টেশনে। নেমে দাঁড়িয়ে রইলাম। মান-অভিমান সব ভেঙে গেল। হয়তো ভয়েই। আবার নরসিংদীমুখী অন্য একটা ট্রেনে উঠে পড়লাম।

ট্রেন চলছে তো চলছেই। এতক্ষণ তো লাগার কথা না। সন্ধ্যা গড়াচ্ছে। কিছুই বুঝে উঠতে না পারে জিজ্ঞেস করলাম পাশের এক আপুকে। তিনি জানালেন এটা রাজশাহীগামী ট্রেন। কথাটা শুনে আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। মনে হচ্ছিল আমার এই ছোট্ট হৃদয়ে কেউ যেন হাতুড়ি পেটা করছিল।

কিছুক্ষণ পর ট্রেনটা থেমে গেল। কোনো স্টেশন না। ইঞ্জিন নষ্ট হয়েছে। রাত তখন আনুমানিক এগারোটা হবে। অবুঝ আমি কী করব, ভেবে উঠতে পারছিলাম না। ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। ভাবলাম, আর এগুনো যাবে না। হেঁটে হলেও বাড়িতে যেতে হবে। নেমে উল্টো দিকে হাঁটা দিলাম। এক পর্যায়ে পা দুটো যেন অবশ হয়ে গেল। প্রচুর ভয় করছিল। সাঈদ আর আমি একটি চাদরের ভেতর এঁটে সেঁটে হাঁটছিলাম। অনেকদূও হেঁটে আসার পর ক্লান্ত শরীর নিয়ে শুয়ে পড়লাম হাঁটা পথের একপাশে। চোখে জল। মনে মনে ভাবছি, আম্মু কেন মারতে গিয়েছিল! আর আমিই-বা কে ট্রেনে উঠতে গেলাম। এসব ভাবতে ভাবতে একটা সময় গভীর নিদ্রায় ডুবে গেলাম।

শিশিরসিক্ত প্রভাতে ঘুমটা ভেঙে গেল। আলো ফুটেছে আবছা আবছা। অন্ধকার

এখানে ওখানে লেগে আছে এখনও। সাঈদ তখনো জাগেনি। হঠাৎ অদূরেই ঝাপসা চোখে দেখতে পেলাম, কুয়াশার পর্দা দোলাতে দোলাতে একটা ধীরগামী ট্রেন আসছে। এক ঝাটকায় সাঈদকে টেনে উঠালাম। আল্লাহর কী অপার কুদরত! আমাকেও জাগিয়ে তুললেন, ট্রেনটাকেও ধীর করে দিলেন কুয়াশার মাধ্যমে! আবার সে পথেই হাঁটতে লাগলাম। আশেপাশে কিছুই চোখে পড়ছে না। বিরানভূমি। সবুজ ও বিস্তৃত। একটু পর কোত্থেকে যেন এক ঝাঁক মৌমাছি ধেয়ে আসলো আমাদের দিকে। সাঈদ দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু আমি দিলাম দৌড়। আশ্চর্য! সেগুলো আমার পেছন পেছনই ছুটলো। বেশি যেতে পারলাম না। পড়ে গেলাম। দু হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কাঁদতে লাগলাম। আমার জন্য একটুও মায়া হলো না মৌমাছিগুলোর। কামড়ে দিলো মনের মতো। তখন নিজেকে এতো অসহায় মনে হচ্ছিল যে, লাগছিলো পৃথিবী এটুকুই। সংকুচিত। কান্নার আওয়াজ কাঁপিয়ে তুলছিল আশপাশ, কিন্তু শোনার মতো কেউ ছিল না।

ডুকরে কাঁদছিলাম। উঠে এবার উল্টো দিকে হাঁটতে লাগলাম। সারা দুপুর হেঁটে পৌঁছলাম এক স্টেশনে। টাঙ্গাইল, করটিয়া। স্টেশনের সংস্কার কাজ চলছিল। একটু দূরে সাত-আট ফুট নিচে একটা দোকান দেখে নিচে নামলাম। দোকান থেকে আম্মুকে ফোন দিলাম।

এখনো মনে হলে রক্ত হিম হয়ে আসে। আম্মু কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, ‘বাবা, তুই কোথায়?’

আমি শুধু বলতে পারলম, ‘করটিয়া।’ তারপর দোকানের সামনেই কান্নায় ভেঙে পড়লাম। আমার কান্না ও অসহায়ত্ব আঁচ করতে পেরে দোকানি লোকটি কার সঙ্গে যেন কথা বলল। তারপর আমাকে ও সাঈদকে জোর করে একটা টিনের ঘরে আটকে রাখল। লোকটার কোনো উত্তর না দিয়ে আমি শুধু ফুঁসছিলাম আর কাঁদছিলাম। চোখের সামনে শুধু অন্ধকার।

কিছুক্ষণ পর আরো পাঁচজন লোক এলো। দোকানদারটি বলল, ‘সরদার! এই ছোকরাডি-ই।’

সরদার অভিহিত লোকটি আমাদের জিজ্ঞেস করল আমাদের বাড়ি কোথায় আর কেন এসেছি। আমি সব বলে দিলাম। একেবারে সবিস্তারে। লোকটির বোধহয় আমার ক্ষুধার্ত, বেদনাক্লিষ্ট মুখ, ভয়ার্ত, আতংকিত চোখ আর কাঁপা কাঁপা গলা দেখে মায়া লেগেছিল। আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেল। দুদিন পর তৃপ্তি ভরে ভাত খেলাম। লোকটির কিশোরী মেয়েটি আমাদের জন্য বিছানা করে দিল। শুতে না শুতেই হৈচৈ আওয়াজ শুনলাম। ২০-২৫ জন মহিলা আমাকে দেখতে এসেছে। তারা একের পর এক প্রশ্ন ছুড়ছিল। মনে হচ্ছিল যেন তীর ছুড়ছিল। আমি নিঃশব্দে কাঁদছিলাম। কিছুক্ষণ পর্যন্ত পালাক্রমে চলতে থাকে পরিদর্শন।

তারপর রাত নটার দিকে শুয়ে পড়লাম। সে বাড়ির একটাই রুম ছিল। খাটও একটা। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি আমার আশ্রয়দাতা বাড়িওয়ালা লোকটি সস্ত্রীক বাইরে খরকুটোয় কাঁথা বিছিয়ে শুয়েছেন।

গভীর রাতে কথার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। ঝাপসা চোখে চেয়ে দেখি আব্বু দাঁড়িয়ে। কাঁদছিলেন। আমি উঠেই লেপ্টে গেলাম আব্বুর বুকে। এভাবে অনেকক্ষণ।

আশ্রয়দাতা মহৎপ্রাণ সেই লোকটির কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে চোখে আবারও অশ্রুর বান নেমে এলো। আব্বু লোকটির কৃতজ্ঞতা আদায় করছিলেন বারবার। অশ্রুসজল চোখে বিদায় নিলাম তাদের কাছ থেকে।

লোকটির কাছে আমরা সবাই চির ঋণী হয়ে আছি। তারপর কত বছর হলো। জীবনের কত কিছুতে কত পরিবর্তন ঘটল। কিন্তু স্মৃতির পাতায় পলায়নের সেই কাহিনি এবং আশ্রয়দাতা মহৎপ্রাণ সেই লোকটির কথা স্মৃতির পাতায় আজও জ্বলজ্বল করছে। লোকটির বাড়িতে তারপর আরও যাওয়া হয়েছিল। যে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছিলেন তিনি, সেই দায় শোধ করতে। সে আরেক গল্প, আরেকদিন হবে এই নিয়ে আলাপ।

লেখক : শিক্ষার্থী, জামিয়াতুল মাআরিফ আলইসলামিয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ১২০৪



মধ্যবিত্ত বাবা-মা

তাশরীফ আহমাদ

সেদিন দুপুরে বাড়ির উঠোনে চেয়ার পেতে বসে বই পড়ছিলাম। হঠাৎ একটা লাল পিঁপড়ে এসে আমার পায়ে কামড় দেয়, বই পড়ার মনোযোগটা আপাতত শেষ। একটু চুলকালাম, বেশ ভালো লাগছে। এখন যেদিকটায় আমি বসে আছি, সেটা পশ্চিম। কড়ুই গাছ ও মেহগনি গাছের শামিয়ানায় ছাওয়া জায়গাটা। পাশেই আমাদের পুকুর। এখানে বসে বই পড়তে বেশ লাগে। পূর্ব পাশটায় প্রচণ্ড রোদ আসে। সেখানটা কাপড় শোকাবার জন্য, বাঁশ দিয়ে আড় বানানো হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে আম্মা কিছু ভেজা কাপড় নেড়ে গেছেন। আমাদের কাপড়ের সঙ্গে বাবার পাঞ্জাবিও আছে সেখানে। বাবার পাঞ্জাবিটা আমাদের জামার সাথে বড্ড বেমানান দেখাচ্ছিল। আমার স্মৃতিতে যতটুকু স্মরণ আছে, প্রায় সাত-আট বছর যাবৎ দেখে আসছি এ জামাটা, শুধু এ জামাটাই না, বাবার সবগুলো জামাই বেশ পুরানো।

বই পড়ার আগ্রহটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। বাবার জন্য দুঃখ হলো। এই মানুষটা এমন কেন? তাঁর কি কোনো রুচিবোধ নেই? এই মানুষটা কী এমন করতে চায়? আমাদের সুখ কি তাদের দুঃখ সয়ে যাওয়ার মধ্যেই? নিজের ইচ্ছেকে গলাটিপে হত্যা করে, সন্তানের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া। আচ্ছা, পৃথিবীর সব বাবাই এমন করে, না আমাদের মতো নিম্ন মধ্যবিত্তের বাবারা এমন করে?

আমরা কিছুদিন পরপর জামা বানাই, কিন্তু বাবা সেই কবেকার বানানো জামাগুলোই পরছেন। আজ পাঁচ বছর যাবৎ, বাবাকে কোনো ঈদে, নতুন জামা নিতে দেখিনি। কিন্তু ঈদের দুমাস আগেই আমাদের জিজ্ঞেস করেন, এবার জামার জন্য কত টাকা লাগবে? এবার আরো ভালো জামা বানাবে। কখনও কোনো কষ্ট করবে না। যা পছন্দ হবে তাই বলবে। আমি আমার রক্ত বিক্রি করে হলেও তোদের জন্য করবো।

বাবার পাঞ্জাবিটা দেখার পর মেজাজটা চটে যায়। রেগে ফুঁসে পাঞ্জাবিটা হাতে নিয়ে আম্মাকে জিজ্ঞেস করি–'এ পাঞ্জাবিটা আর কত বছর পরবে আব্বা?'

আম্মা অসহায়ের মতো করে বলেন, 'আমি তো তোর বাবারে কতো করে বললাম, একটা নতুন জামা বানাতে, কিন্তু তোর বাবা বানায় না, আমা কী করার আছে!' এরই মাঝে আমাদের সংসারের শাহজাদি দৌড়ে এসে বলে, 'ভাইয়া, তুমি কাকে বলছ আব্বুর জামার কথা?'

'কেন, আম্মাকে বলেছি!'

'ভাইয়া, তুমি তাঁকে জিজ্ঞেস করো সে কেন নতুন কাপড় নেয় না?'

আমি আম্মার কাপড়ের দিকে কোনোদিন খেয়াল করিনি। আজ দেখে মনে হচ্ছে, এ সংসারের অনেক বোবা কষ্টের আর্তচিৎকার আমার কানে আসে না, বা কখনো আসতে দেওয়া হয় না।

এরপর আম্মাকে আর কিছু বলিনি। লজ্জায় কুঁকড়ে গেছে আমার আমি। তাঁদের কাছে আজন্ম হার মেনেছে আমার আমি।

ভালো থাকুন পৃথিবীর নব নিম্ম মধ্যবিত্ত বাবা–মা। ভালো থাকুন আমার আব্বা এবং আম্মা।

লেখক : ছাত্র, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া দক্ষিণ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা



শীত ও শীতের স্মৃতিময় শৈশব

আবদুল্লাহ শাকের

শীত। ষড়ঋতুর পঞ্চম ঋতু। পৌষ আর মাঘ–এই দুই মাস মিলে হয় শীত। হেমন্তের নবান্নের উৎসবের পরে আমাদের দুয়ারে কড়া নাড়ে শীতের হিমহিম সমীর। এ সমীর তনুমনে শীতল ভালোলাগার জানান দিয়ে যায়।

আমাদের পাড়া-গাঁয়ে শীত আসে দেহমন কাঁপিয়ে। প্রভাতে ঘন কুয়াশায় দশদিকের সবকিছু ঝাপসা ঝাপসা লাগে। মনে হয় পুরো পৃথিবী বুঝি ঘোলাটে হয়ে আছে। তবু ভোরপাখিদের কিচিরমিচির আর বড়ই পড়ার টুব টুব শব্দ শোনা যায়। এ শব্দে গ্রামবাসীদের ঘুম ভাঙে।

কনকনে শীতের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা গাঁয়ের খেটে খাওয়া মানুষের জন্য যেন কিছুই নয়। ভোরের কুসুম ফুটলে কিংবা হালকা রোদের উদয় হলে কৃষক ছুটে যায় লাঙল কাঁদে। তার প্রিয় ক্ষেতফসলে। মাঝি চলে নদীর তটে বৈঠা লগি নিয়ে। ঘুম ভেঙে রাখাল ছোটে গরু নিয়ে। তার চিরচেনা গবাদিপশুর চারণভূমিতে। ভরদুপুরে বাঁশের বাঁশির সুরে সুরে মাতিয়ে তোলে আশপাশের সবাইকে। প্রত্যুষে পাতিল হাতে ঘরণী যায় চুলোর পাশে। গ্রাম-বাংলার এসব দৃশ্য আজও বিদ্যমান।

গ্রামের ফেলে আসা অনেক স্মৃতিই মাঝে মাঝে নাড়া দিয়ে ওঠে। কারণ, আমার শৈশব কেটেছে গ্রামের মাটিতে। যে মাটির সাথে মিশে শুঁকতে চেয়েছি মাটির গন্ধ। মাটির খাতায় এঁকেছি কত আল্পনা। আজ ওগুলো কেবল কল্পনার মতো মনে হয়।

মনে পড়ে, সাতসকালে কেমন করে দূর্বাঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে যেতাম সাদা সাদা শিশিরবিন্দু মাড়িয়ে। সকালবেলার এ শিশিরবিন্দু আমার কাছে মহৌষধ মনে হতো। মাঝে মাঝে নানাকে নিয়ে ছুটে যেতাম 'নয়নজোড়া' বনে সবুজ ধানচারার ক্ষেতে। ঝকঝকে শিশিরবিন্দু শিশিতে ভরে নিয়ে আসতাম। গোধূলিতে খেলাধুলা করে বন্ধুবান্ধব মিলে আগুন পোহানোর সেই দৃশ্য আজও চোখের সামনে ভাসমান। হরেক রকম পিঠপুলির গন্ধে মন আকুল হয়ে থাকতো। ধামাপিঠে কলাপিঠের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্মৃতির বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে থাকা সেই দৃশ্যগুলো খুব মনে পড়ে এখন।

আমাদের পাড়া-গাঁয়ে শীত মৌসুমে ওয়াজ মাহফিলের ধুম পড়ে যেত। সুযোগ পেলেই চলে যেতাম এসব মাহফিলে। কখনো মায়ের অনুমতি নিয়ে, আবার কোনো কোনো সময় মায়ের অনুমিত ছাড়াই, লুকিয়ে। ফিরে আসার পর মায়ের কী যে বকুনি খেতে হতো এখনো তা কানে ভাসে। বকুনি খেয়ে খেয়ে বলতাম, 'আম্মু, আর কক্ষণো যাব না!' কিন্তু পরবর্তী কোনো মাহফিলের সময় সেই কথা বেমালুম ভুলে যেতাম।

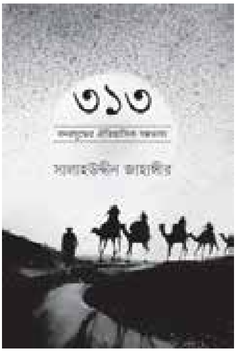
জীবনের প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে ইট-পাথরের শহরে এখন আমার বসবাস। শীতের মওসুম যায়, গাঁয়ের শীতলভেজা সেই রূপ দেখার সৌভাগ্য আমার আর হয় না। দেখা হয় না ঘাসের ডগায় গাছের পাতায় শিশিরের জমে থাকা আর বাঁশঝাড়ের কঞ্চি বেয়ে পানি ঝরে পড়ার আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্যগুলো। এ সবই আজ হয়ে গেছে ধূসর স্মৃতি।

চনমনে শৈশবের কাছে ফিরে যাবার অসম্ভব আকুতি নিয়ে এই তো আমাদের বেঁচে থাকা

লেখক : শিক্ষার্থী, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

৩১৩ : বদরযুদ্ধের ঐতিহাসিক গল্পভাষ্য

বই পরিচিতি



লেখক: সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর
মূল্য: ৩৪০ টাকা
প্রকাশক: নবপ্রকাশ
দূরালাপন: ০১৯৭৪৮৮৮৪৪১

বদরযুদ্ধে মক্কার কুরাইশনেতা আবু জাহেলকে হত্যাকারী দুজন সাহাবির ব্যাপারে নিশ্চয় শুনেছেন আপনি। কখনো কি প্রশড়ব জেগেছে–আবু জাহেলকে হত্যা করেন যারা তারা সত্যি নিতান্ত দুজন বালক ছিলেন মাত্র?
যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একাধারে ১৩ বছর বিনীতকণ্ঠে মানুষের দ্বারে দ্বারে ইসলামের বাণী নিয়ে গেছেন, শত অত্যাচার, অপমান আর গলাধাক্কা সত্ত্বেও যিনি সামান্য প্রতিবাদ করেননি; মদিনায় আগমনের এক বছর যেতে না যেতেই কেন তিনি হাতে তুলে নিলেন ধারালো তরবারী? বদরযুদ্ধ কি অবশ্যম্ভাবী ছিল?
মাত্র ৩১৩ জন মুসলিমের এক মামুলি সেনাদল, অন্যদিকে রণসজ্জায় সজ্জিত এক হাজার কুরাইশের উদ্ধত বাহিনী। ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেয়া এ যুদ্ধজয় আরবের বুকে ইসলামের ভিত এত মজবুতভাবে প্রোথিত করেছিল, মাত্র ২০ বছর পর বিজয়ী সেনাদলের উত্তরসূরীরা পদানত করেছিল রোম-পারস্যের বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য।
বদরযুদ্ধ নিয়ে অসংখ্য রূপকথা, মিথ, গল্প, উপাখ্যান তৈরি হয়েছে পৃথিবীর নানা জনপদে, বিভিনড়ব ভাষায়। সবকিছু ছাপিয়ে হাদিস ও সিরাতের সূত্রনির্ভর ধারাবর্ণনায় রচিত হয়েছে '৩১৩ : বদরযুদ্ধের ঐতিহাসিক গল্পভাষ্য' বইটি। প্রাঞ্জল ভাষা, সাহসী গদ্য আর গল্পভাষ্যের টান টান উত্তেজনা নিয়ে সিরাতপাঠের নতুন সংযোজনা এ বই। সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর-এর সাহসী কলমের আঁচড়ে তৈরি হয়েছে সিরাতের নতুন আরেক অধ্যায়। একবার পড়তে শুরু করলে যুদ্ধদিনের উপাখ্যান শেষ না করে উপায় নেই।